পুরাণ

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ

সাদেকুল আহসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণ হল বিশ্বজনীন ধ্রুপদী গল্প যা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় এবং আমাদের জীবন গঠনে ভূমিকা রাখে– পুরাণ আমাদের যত ভয়, আকুতি আর আকাঙ্ক্ষা তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে আমাদের সামনে একটা বয়ান উপস্থাপিত করে যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানুষ হিসাবে আমাদের করণীয়।

ISBN 984 70209 0024 5
9 847020 900245

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণ কি? এর উৎপত্তি কিভাবে? এবং আজও আমাদের জীবনে তীব্রভাবে কেন তাদের প্রয়োজন?

পুরাণ-এর ইতিহাস আসলে মানবতারই ইতিহাস, আমাদের গল্প আর বিশ্বাস, আমাদের আগ্রহ আর জগৎকে বুঝতে আমাদের যাবতীয় প্রয়াস, আমাদের সাথে আমাদের পূর্বপুরুষের এবং আমাদের পরস্পরের ভিতরে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানে বুঝতে পুরাণ আমাদের সাহায্য করে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং আমাদের হাতে ধরে প্যালিওথিলিথিক পর্ব আর শিকারীদের পুরাণ থেকে গত পাঁচশ বছরের "মহান পশ্চিমা বিবর্তন" ঘুরিয়ে আনেন আর বিজ্ঞানের হাতে পুরাণের মানহানির জবাব দেন।

আর্মস্ট্রংয়ের পরিজ্ঞান আর বাগ্মীতা যা তার বৈশিষ্ট্য বৃহত্তর অর্থে পুরাণ সম্বন্ধে ভাবতে আমাদের বাধ্য করেন– এবং একে নাকচ করলে কেন আমাদের ক্ষতি সেটার ব্যাখ্যা দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ক্যারেন আর্মস্ট্রং রোমান ক্যাথলিক হিসেবে সাত বছর অতিবাহিত করার পর ১৯৬৯ সালে বৃত্তি ত্যাগ করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হতে আরবীতে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং এক সরকারি বালিকা স্কুলে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি ফ্রিল্যান্স লেখক ও ব্রডকাস্টারে পরিণত হন। দীর্ঘদিন থেকেই যুক্তরাজ্যে ধর্মীয় বিষয়ে অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার তিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই মর্যাদা অর্জনের পথে। বর্তমানে তিনি লিও বায়েক কলেজে জুডাইজম বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন এবং রাব্বী ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সোশ্যাল সায়েন্স-এরও সম্মানিত সদস্য। ১৯৯৯ সালে তিনি 'মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স' কাউন্সিল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : *গ্রু দ্য ন্যারো গেইট, বিগিনিং দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য গসপেল অ্যাকর্ডিং টু ওম্যান, হলি ওআর : দ্য ক্রুসেডস্ অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন টুডে'স ওয়ার্ল্ড, দ্য ইংলিশ মিস্টিকস্ অব দ্য ফোরটিন্থ সেঞ্চুরি, আ হিস্ট্রি অব গড : দ্য ফোর থাউজেন্ড ইয়ার কোয়েস্ট অব জুডাইজম, ক্রিশ্চানিটি অ্যাণ্ড ইসলাম, জেরুজালেম : ওয়ান সিটি, থ্রি ফেইথস্, ইন দ্য বিগিনিং : আ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অব জেনেসিস, ইসলাম : আ শর্ট হিস্ট্রি, বুদ্ধ, দ্য ব্যাটল ফর গড : আ হিস্ট্রি অব ফাণ্ডামেন্টালিজম ও মিথ : আ শর্ট হিস্ট্রি*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

A Short History of Myth

Karen Armstrong

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান

সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেশ

ISBN-984-70209-0024-5

পুরাণ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান

A Short History of Myth by Karen Armstrong

Copyright © Karen Armstrong 2005

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৯ সন্দেশ

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১০০.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার প্রকাশক
লুৎফর রহমান চৌধুরী-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদেকুল আহসান অনূদিত আরো বই :

বিলুপ্তির স্মৃতি (দ্য ম্যান বুকার প্রাইজ ২০০৬ বিজয়ী উপন্যাস) / কিরণ দেশাই
দ্য ইংলিশম্যানস্ বয় / গি ভন্দেরহেজ
দ্য টুইনস্ / টেসা ডি লু
আ শর্ট হিস্টরি অব মিথ / ক্যারেন আর্মস্ট্রং
দ্য কাইট রানার / খালেদ হোসেইনি
হুয়াইট টিথ / জেডি স্মিথ
মাই নেম ইজ রেড / ওরহান পামুক

দ্য কেভ্স অব স্টিল / আইজাক আসিমভ (সায়েন্স ফিকশন রোবট সিরিজ)
আই রোবট / আইজাক আসিমভ (সায়েন্স ফিকশন রোবট সিরিজ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিক্রম

১. মিথ (পুরাণ) কাকে বলবো?	৯
২. প্যালিওলিথিক যুগ : শিকারীদের পুরাণতত্ত্ব (প্রায় ২০,০০০ বছর পূর্ব থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮,০০০ সাল)	১৫
৩. নিওলিথিক পর্ব : কৃষাণের পুরাণ কথা (অষ্টম সহস্রাব্দ থেকে চতুর্থ সহস্রাব্দ)	২৮
৪. সভ্যতার সূচনাপর্ব (খ্রি : পূ: ৪০০০ থেকে খ্রি: পূ: ৮০০ সাল) :	৩৬
৫. যুগান্তকারী পর্ব (খ্রি: পূ: ৮০০ থেকে খ্রি: পূ: ২০০)	৪৬
৬. যুগান্তকারী পর্বের পরবর্তী সময় (খ্রি: পূ: ২০০০-১৫০০)	৫৭
৭. পাশ্চাত্যের মহান রূপান্তর (পনের শতক থেকে বিংশ শতক)	৬৪
তথ্যসূত্র	৭৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. পুরাণ কাকে বলবো?

মানব সম্প্রদায় বরাবরই মিথ (পুরাণ) নির্মাতা। প্রত্নতত্ত্ববিদের দল নিয়ানডারথাল কবর খুঁড়ে পেয়েছেন অস্ত্র, যন্ত্রপাতি আর উৎসর্গীকৃত পশুর হাড়, যা তাদের নিজেদের জগতের মতোই ভবিষ্যৎ জগতের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসের কথা বলে। নিয়ানডারথাল মানুষেরা হয়তো তাদের মৃত পূর্ব পুরুষেরা এখন উপভোগ করছে এমন জীবনের কথা গল্পের ছলে একে অন্যকে বলত। মৃত্যুকে নিশ্চিতরূপেই তারা এমনভাবে অভিব্যক্ত করত যা তাদের সমসাময়িক অন্যান্য প্রাণীরা সেরকমভাবে দেখত না। জীবজন্তু একে অন্যকে মারা যেতে দেখে, আমরা যতদূর জানতে পারি, ব্যাপারটা নিয়ে তারা খুব একটা ভাবিত হয় না। কিন্তু নিয়ানডারথাল কবরগুলো থেকে আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারি যে এসব প্রাচীন মানুষ যখন তাদের নশ্বরতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে তখন তারা এক ধরনের পাল্টা আখ্যান তৈরি করে যা তাদের এই নশ্বরতার সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। নিয়ানডারথাল লোকেরা যারা তাদের সঙ্গীদের এহেন যত্নের সাথে সমাধিস্থ করেছে বোঝাই যায় দৃশ্যমান বস্তুগত জগৎই যে একমাত্র বাস্তবতা না সেটা তারা কল্পনা করতে সক্ষম হয়েছিল। বহু প্রাচীন কাল থেকেই, সেজন্য এটা প্রতীয়মান হয় যে মানুষ তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অতীত, কল্পনা করার শক্তির কারণে স্বতন্ত্র।

আমরা কার্য-কারণ সন্ধানী প্রাণী। কুকুর, আমরা যতদূর জানতে পারি, তাদের সারমেয় জন্ম নিয়ে যন্ত্রণা অনুভব করে না, বিশ্বের অন্য প্রান্তের কুকুরের দুর্দশা নিয়ে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তায় ভোগে না বা নিজেদের জীবন কোনো ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে দেখার চেষ্টা করে না। কিন্তু মানুষ খুব সহজেই হতাশায় আক্রান্ত হয় এবং সভ্যতার শুরু থেকে আমরা গল্প তৈরি করেছি, আমাদের জীবনকে একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করে যা একটা মূলগত ছক উন্মোচিত করে এবং হতাশাজনক আর বিশৃঙ্খলতার প্রমাণের বিপরীতে, জীবনের মানে আর মূল্য সম্পর্কে আমাদের মাঝে একটা বোধের জন্ম দেয়।

মানুষের মনের আরেকটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো আমাদের যুক্তিগতভাবে ব্যাখ্যার অতীত ধারণা এবং অভিজ্ঞতা অনুভব করার ক্ষমতা। আমাদের কল্পনা শক্তি, এমন একটা ক্ষমতা যা তাৎক্ষণিকভাবে বর্তমান/উপস্থিত না এমন কিছু ভাবতে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য করে এবং আমরা প্রথম যখন সেটা কল্পনা করি তা তখন বাস্তবিক অস্তিত্বহীন। এই কল্পনাশক্তিই মিথ/পুরাণ এবং ধর্মের সৃষ্টিকারী। আজকাল পৌরাণিক চিন্তা খ্যাতিহীনতার গর্ভে পতিত হয়েছে; আমরা প্রায়শই একে অযৌক্তিক এবং আত্ম-প্রশ্রয়ী অভিধা দিয়ে বাতিল করে দেই। কিন্তু কল্পনাশক্তিই আবার বিজ্ঞানীদের নতুন জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে এবং তাদের এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা করে যা আমাদের দক্ষতা পক্ষান্তরে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানীদের কল্পনাশক্তির বরাভয়ে আমরা মহাশূন্যে ভ্রমণ করে চাঁদের বুকে হাঁটতে সক্ষম হয়েছি, যা একটা সময়ে কেবল পৌরাণিক আখ্যানের অংশ ছিল। বিজ্ঞান এবং পুরাণ উভয়েই মানুষের সম্ভাবনার সীমা বৃদ্ধি করেছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ন্যায় আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে পুরাণও, এই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে চিন্তা করেনি বরং এখানেই আরও সক্রিয় আরও প্রাণবন্তভাবে বাঁচতে আমাদের সহায়তা করেছে।

নিয়ানডারথাল সমাধিক্ষেত্র পুরাণের পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। প্রথমত, বিলুপ্তির ভয় এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতার ভিতরেই প্রায় সবসময়েই এর মূল নিহিত থাকে। দ্বিতীয়ত, পশুর অস্থি সাক্ষ্য দেয় যে সমাধিস্থ করবার সময় পশু উৎসর্গ করা হয়েছিল। পুরাণতত্ত্বকে সাধারণত প্রথাগত অনুষ্ঠান থেকে আলাদা করা যায় না। অনেক মিথ মূলত গণপ্রার্থনা অনুষ্ঠান, যা ছাড়া তাদের প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব না এবং ইহজাগতিক প্রেক্ষাপটে তাদের অর্থ অনুধাবন করা অসম্ভব। তৃতীয়ত, নিয়ানডারথাল পুরাণ সমাধি ছাড়া অন্যভাবে মানব জীবনের স্বল্পতার, তার সীমিত আয়ুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সব শক্তিশালী পুরাণই মানবিক অনুভূতির চরম মাত্রা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করতে তারা আমাদের বাধ্য করে। একটা সময় আসে যখন আমাদের সবাইকে একভাবে না একভাবে এমন একটা স্থানে যেতে হবে যা আমরা আগে কখনও দেখিনি এবং এমন কাজ করতে হবে যা আমরা আগে কখনও করিনি। অজ্ঞাতকে নিয়েই পুরাণ; এটা এমন একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় প্রাথমিকভাবে যা বর্ণনা করবার মতো শব্দ আমাদের সঞ্চয়ে ছিল না। পুরাণ তাই চূড়ান্ত নীরবতার গভীরে উঁকি দেবার একটা প্রয়াস। চতুর্থত, পুরাণ কেবল তার খাতিরে কোনো গল্প বলা না। সে আমাদের শেখায় আমাদের আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত। নিয়ানডারথাল সমাধিতে, কিছু কিছু মৃতদেহ ভ্রূণের অবস্থানে সমাধিস্থ দেখা যায় যেন পূনর্জন্মের প্রতীক্ষায় রয়েছে : পরবর্তী পদক্ষেপ মৃত ব্যক্তিকে নিজে উদ্যোগী হয়ে নিতে হবে। সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে, পুরাণতত্ত্ব, এই পৃথিবীতে বা পরবর্তী কোনো জগতে, সঠিক কাজের জন্য উপযুক্ত আত্মিক বা মানসিক মনোভাব আমাদের মাঝে আরোপ করে।

সর্বশেষ, প্রতিটি পুরাণই আমাদের নিজস্ব জগতের পাশাপাশি অবস্থিত আরেকটা প্রেক্ষাপটের কথা বলে এবং যা এক অর্থে আমাদের জগৎকে সমর্থন করে। এই অদৃশ্য কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী বাস্তবতায় বিশ্বাস স্থাপন, যাকে কখনও কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতাদের পৃথিবী বলে অভিহিত করা হয়, পুরাণতত্ত্বের মূল আঙ্গিক। অনেক সময়ে একে বারোমেসে দর্শন হিসাবে অভিহিত করা হয় কারণ আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিকতার আগমনের পূর্বে সব সমাজব্যবস্থার সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং কৃত্যানুষ্ঠান, পুরাণতত্ত্বকে অবহিত করত এবং বর্তমানেও অনেক সনাতন সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। বারোমেসে দর্শন অনুসারে, এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, সবকিছু যা আমরা এখানে দর্শন বা শ্রবণ করে থাকি, তার একটা প্রতিরূপ রয়েছে দিব্যলোকে যা আমাদের এখানের চাইতে অনেক বেশি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী এবং অনেক বেশি স্থায়ী।[১] এবং প্রতিটি পার্থিব বাস্তবতা এর আদিরূপ, মূল ছাঁচের, জেলো সংস্করণ, ত্রুটিযুক্ত প্রতিরূপ। এই দিব্য জগতের অঙ্গীভূত হয়েই কেবল নশ্বর ভঙ্গুর মানুষ তাদের সম্ভাবনা সার্থক করে তুলতে পারে। মানুষ অন্তর্জ্ঞানে যা অনুভব করে পুরাণ তাকেই পরিপূর্ণ সুনির্দিষ্ট আকৃতি এবং রূপ দান করে। পুরাণ তাদের কাছে দেবতাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে, অলস অনুসন্ধিৎসা থেকে না বা এসব আকর্ষণীয় শোনায় বলে না, যাতে এসব শক্তিশালী সত্তাকে মানুষ নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনুকরণ করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের মাঝে দিব্যসত্তাকে অনুভব করতে পারে।

আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক সংস্কৃতিতে, আমরা প্রায়শই দৈবকে সাধারণ ভঙ্গিতে প্রকাশ করে থাকি। প্রাচীনকালে, 'দেবতা'দের খুব কম সময়েই অসংলগ্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী সম্পূর্ণ ভিন্ন বিমূর্ত অস্তিত্বে বসবাসকারী অতিপ্রাকৃতিক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আধুনিক মতে পুরাণভত্ত্ব ধর্মতত্ত্বের সাথে না বরং মানুষের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। মানুষ মনে করে যে দেবতা, মানুষ, জীবজন্তু এবং প্রকৃতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, একই নিয়মের অধীন এবং একই দিব্যসত্তা থেকে উদ্ভূত। শুরুতে দেবতাদের জগৎ আর মানুষের জগতের ভিতরে কোনো ধরনের অস্তিত্বের ফারাক বিদ্যমান ছিল না। মানুষ যখন দৈবের কথা বলতো তখন যেন তারা জাগতিক পৃথিবীর একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়েই আলোচনা করছে বলে মনে করতো। দেবতাদের অস্তিত্ব কোনো ঝড়, সাগর নদী থেকে বা মানুষের প্রচণ্ড অনভূতি– ভালোবাসা, ক্রোধ বা যৌন অনুভূতি থেকে অচ্ছেদ্য ছিল যা ক্ষণিকের জন্য যেন নারী পুরুষকে অস্তিত্বের একটা ভিন্ন স্তরে উন্নীত করতো যাতে করে জগৎকে তারা একটা ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে সক্ষম হয়।

পুরাণতত্ত্ব আমাদের তাই মানবজীবনের সমস্যাসঙ্কুল দশার সাথে মানিয়ে নেয়ার মতো করে প্রণীত হয়েছে। মানুষকে জগতে নিজের স্থান এবং তার যথাযথ পরিচিতি খুঁজে নিতে এটা সাহায্য করে। কোথা থেকে আমরা এসেছি এটা সবাই জানতে চায় কিন্তু আমাদের শুরুটা যেহেতু প্রাকইতিহাসের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে পুরাণের জন্ম দিয়েছি যা ইতিহাসনির্ভর নয় কিন্তু পরিবেশ, প্রতিবেশী এবং প্রথা সম্পর্কে আমাদের বর্তমান অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করে। আমরা আরও আমাদের পরিণতি সম্পর্কে জানতে চাই, তাই আমরা গল্পের অবতারণা করেছি যা মৃত্যুপরবর্তী অস্তিত্বের কথা বলে– যদিও পরবর্তীকালে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখব, খুব বেশি পুরাণে মানুষের জন্য অমরত্বের কথা বলা হয়নি। এবং আমরা সেইসব মহিমান্বিত মুহূর্ত ব্যাখ্যা করতে চাই যখন আমরা আপাতভাবে আমাদের সাধারণ সত্তার উর্ধ্বে উন্নীত হই। দেবতারা মানুষের এই অভিজ্ঞতার সীমানা অতিক্রম করাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেন। আমাদের সহজাত অনুভূতি বারোমেসে দর্শন ব্যাখ্যা করে যে চর্মচক্ষুতে আমরা নিজেদের যে পার্থিব জগতে দেখি তার অতিরিক্ত কিছু একটা রয়েছে।

আজকাল 'পুরাণ' দ্বারা এমন কিছু ব্যাখ্যা করা হয় যা সত্যি হতে পারে না। পাপাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত রাজনীতিবিদ 'মিথ' বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবেন, মানে, তেমনটা কখনও ঘটেনি। পৃথিবীর বুকে দেবতাদের হেঁটে বেড়াবার, সমাধি থেকে মৃতদের বের হয়ে আসবার বা শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে পছন্দের লোকদের পালাবার সুযোগ করে দেয়ার কথা আমরা যখন শুনতে পাই, সাথে সাথে এসব গল্পকে অবিশ্বাস্য প্রতিপাদন করা সম্ভব না বিধায় অসত্য বলে, তাদের আমরা নাকচ করে দেই। অষ্টাদশ শতক থেকে ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে; আসলে কি ঘটেছিল সে বিষয় আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাক-আধুনিক যুগে, মানুষ যখন অতীত সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করত তখন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোনো ঘটনার আসল তাৎপর্য। পুরাণ তেমনই কোনো ঘটনা, আপাতদৃষ্টিতে যা একদা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু একই সাথে যা সবসময়েই ঘটে চলেছে। ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কঠোর কালানুক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, এ ধরনের পুনরাবৃত্তি বর্ণনা করার মতো কোনো শব্দ আমাদের সঞ্চয়ে নেই, কিন্তু পুরাণতত্ত্ব এক ধরনের শিল্পমাধ্যম, মানবঅস্তিত্বে যা কিছু ধ্রুপদী সময়ের সীমা অতিক্রম করে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এলোমেলো ঘটনার বিশৃঙ্খল প্রবাহের উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে এবং বাস্তবতার মূল অংশবিশেষ আমাদের সামনে তুলে ধরে।

বোধবুদ্ধির সীমানা অতিক্রম করাটা সব সময়ে মানুষের অভিজ্ঞতার একটা অংশ। আমরা পরমানন্দের মুহূর্ত অনুসন্ধান করি যখন আমাদের অনুভূতিগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হয় এবং ক্ষণিকের তরে আমরা আমাদের সত্তার উর্ধ্বে আরোহণ করি। সেইসব মুহূর্তে, মনে হয় যেন আমরা ভীষণভাবে বেঁচে আছি এবং আমাদের মানবতার পুরোটাই যেন জেগে উঠেছে। পরমানন্দ লাভের সবচেয়ে সনাতন উপায়ের মধ্যে একটা হলো ধর্ম কিন্তু মানুষ যখন মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় কিংবা সিনাগগে তাকে খুঁজে না পায় তারা তাকে অন্যত্র খোঁজার চেষ্টা করে : শিল্পকলা, সঙ্গীত, কবিতা, নৃত্য, মাদক, যৌনতা বা অন্য কিছু। সঙ্গীত বা কবিতার মতো, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং বিলুপ্তির সম্ভাবনায় আমাদের মাঝে জন্ম নেয়া হতাশা উড়িয়ে দিয়ে, পুরাণতত্ত্ব তুরীয় আনন্দ আমাদের মাঝে জাগ্রত করবে। কোনো পুরাণ যদি তা করা বন্ধ করে তবে বুঝতে হবে যে এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে এবং পুরাণটির মৃত্যু ঘটেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণকে সেজন্য চিন্তার অনুন্নত ধরন, যাকে মানুষের বিচারবুদ্ধির উন্মেষের সাথে সাথে দ্বিতীয় কাতারে সরিয়ে দেয়া যাবে এমনটা ভাবা আমাদের ভুল হবে। পুরাণতত্ত্ব ইতিহাস রচনার কোনো প্রাথমিক প্রয়াস না এবং সে এটাও দাবী করে না যে এর সমস্ত গল্পই বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা। উপন্যাস বা নাটকের মতো পুরাণও মনগড়া; এটা একটা খেলা যা 'যদি এমন হতো?' প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমাদের শোকাবহ অসম্পূর্ণ পৃথিবীকে মহিমান্বিত করে তোলে এবং নতুন সম্ভাবনার আশা জোগায়– এই একই প্রশ্ন দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূচনা করেছে। নিয়ানডারথাল মানুষেরা যারা তাদের মৃত সঙ্গীদের নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত করেছে তারাও সম্ভবত এই একই ধরনের মন-গড়া আধ্যাত্মিক খেলায় মেতেছিল, যা সব পুরাণ নির্মাতাদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় : "যদি এমন হয় যে এই পৃথিবীই সবকিছু না? আমাদের জীবনকে এটা কিভাবে প্রভাবিত করে– সামাজিক বাস্তবিক বা মানসিকভাবে? আমরা অন্য কিছুতে পরিণত হই? আরো সম্পূর্ণ? এবং যদি আমরা খুঁজে পাই যে আমরা আসলেই পরিবর্তিত হয়েছি তাহলে কি এটাই বোঝা যায় না যে আমাদের পৌরাণিক বিশ্বাস কোনো না কোনো ভাবে সত্যি, যে আমাদের মানবতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সে আমাদের বলতে চায়, যা যৌক্তিকভাবে আমরা হয়তোবা প্রমাণ করতে অপারগ?"

আনন্দ করার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারার কারণেই মানুষ অনন্য।[২] বন্দিত্বের কৃত্রিম পরিবেশে বসবাস করা ছাড়া, অন্যান্য প্রাণী যখন প্রকৃতির মাঝে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হয় তখন তারা তাদের প্রাথমিক আনন্দের বোধটাই হারিয়ে ফেলে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অবশ্য নানা সম্ভাবনা বাজিয়ে দেখা অব্যাহত রাখে এবং শিশুদের মতো আমরা আমাদের জন্য কল্পনার একটা জগৎ তৈরি করে নেই। চিত্রকলায়, যুক্তি আর কারণের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমরা নতুন আঙ্গিকের ধারণার জন্ম দেই যা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং আমরা বিশ্বাস করি যা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং চরমভাবে 'সত্যি' কিছু একটার কথা বলে। পুরাণ তত্ত্বেও, তেমনি, কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে, আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট করে, আমাদের জীবনে এর প্রভাব বিবেচনা করে আমরা কোনো উপপ্রমেয়কে গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং আবিষ্কার করি যে আমাদের পৃথিবীর বিভ্রান্তিকর সব প্রশ্নের নতুন পরিজ্ঞান আমরা লাভ করেছি।

বস্তুগত তথ্য সরবরাহ করার কারণে না, কার্যকর এ কারণেই, পুরাণ সত্যি। জীবনের গভীর মানের ব্যাপারে সে যদি আমাদের নতুন পরিজ্ঞান দিতে না পারে তবে বলতে হবে পুরাণ ব্যর্থ হয়েছে। যদি এটা কাজ করে, মানে, যদি এটা আমাদের মনমানসিকতা পরিবর্তনে বাধ্য করে, আমাদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করে এবং আমাদের আরো পূর্ণাঙ্গভাবে বাঁচতে বাধ্য করে তবে এটা একটা বৈধ পুরাণ। পুরাণতত্ত্ব আমাদের তখনই পরিবর্তিত করবে যদি আমরা এর অনুশাসন অনুসরণ করি। পুরাণ কার্যত একটা নির্দেশিকা; কি করে আরো ভালোভাবে বেঁচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা যায় সে কথাই সে আমাদের বলে। আমরা যদি এই অনুশাসন আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করি, একে আমাদের নিজেদের জীবনে বাস্তবতা দিতে ব্যর্থ হই তবে বোর্ড গেমের নিয়মের মতো যা অনেক সময় বিভ্রান্তিকর এবং বিরক্তিকর, সেরকম দুর্বোধ্য এবং অব্যবহৃত থেকে যাবে যতক্ষণ আমরা খেলা শুরু না করি।

পুরাণ থেকে আমাদের আধুনিকতার বিচ্যুতি অভূতপূর্ব। প্রাক-আধুনিক যুগের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল পুরাণ। মানুষকে জীবনের মানে বুঝতেই এটা কেবল তাদের সাহায্য করেনি, সেই সাথে মানব মনের এমন সব ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করেছে যা হয়তো অন্যথায় অগম্যই রয়ে যেত। মনোবিদ্যার এটা একটা প্রাথমিক রূপ। দেবতা এবং বীরদের পাতালে অবতরণের গল্প, গোলকধাঁধাঁর মাঝে পথ খুঁজতে খুঁজতে অসুরের সাথে যুদ্ধ, আত্মার রহস্যময় আচরণের উপরে আলো নিক্ষেপ করে মানুষকে দেখিয়েছে কিভাবে নিজেদের মানসিক টানাপোড়েনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। ফ্রয়েড এবং জুঙ আত্মার নবীন অভিযানের রেখচিত্র প্রণয়ন আরম্ভ করার সময়ে, তারা তাদের পরিজ্ঞান ব্যাখ্যা করার জন্য সহজাতভাবেই ধ্রুপদী পুরাণতত্ত্বের দ্বারস্থ হন এবং পুরাতন পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা দেন।

এটা নতুন কিছু না। কোনো পুরাণের একটা অনুমোদিত বা স্বীকৃত ব্যাখ্যা কখনওই থাকে না। আমাদের পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে, আমাদের গল্পগুলোও ভিন্নভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাদের মাঝে বিদ্যমান অনন্ত সত্যিকে অনুধাবনের খাতিরে। পুরাণতত্ত্বের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে, আমরা দেখব যে সামনের দিকে মানুষ যতই বিশাল কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে তারা তাদের পুরাণতত্ত্ব পর্যালোচনা করেছে এবং নতুন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা তার কাছে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সেই সাথে আমরা আরও দেখব যে মানুষের প্রকৃতি আসলে খুব একটা বদলায় নাই এবং এসব পুরাণের অনেকগুলিই, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পিত যা আমাদের নিজেদের সমাজ থেকে খুব একটা আলাদা না, এখনও আমাদের সবচেয়ে অপরিহার্য চাহিদা আর ভয়ের কথাই বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. প্যালিওলিথিক যুগ : শিকারীদের পুরাণতত্ত্ব
(প্রায় ২০,০০০ বছর পূর্ব থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮,০০০ সাল)

মানুষ তাদের ইতিহাসের এই পর্বে দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে গঠনমূলক জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিবর্তন ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। নানা দিক থেকে বিবেচনা করলে এটা একটা ভীতিকর এবং উদ্বেগাকুল সময়। এইসব প্রাচীন মানুষের দল তখনও কৃষিকাজ আয়ত্ত করেনি। তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপন্ন করতে জানত না, জীবনধারণের জন্য তারা পুরোপুরি শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহের উপরে নির্ভরশীল ছিল। শিকারের কৌশল আর আয়ুধের মতোই পুরাণও তাদের উত্তরজীবিতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছিল যা তারা, তাদের শিকার হত্যা করতে এবং তাদের পারিপার্শ্বিকের উপর এক প্রকারের নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করেছিল। নিয়ানডারথালদের মতোই প্যালিওলিথিক নারী ও পুরুষ তাদের পুরাণের কোনো লিখিত বর্ণনা আমাদের জন্য রেখে যায়নি, কিন্তু এসব গল্প মানুষের নিজেদের বুঝতে, তাদের দুর্দশা অনুধাবন করতে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে যে খণ্ডিতভাবে পরবর্তীকালের শিক্ষিত সংস্কৃতির পুরাণের অংশ হিসাবে এসব গল্প লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইসব আদিম মানুষের অভিজ্ঞতা আর চিন্তাধারা, আমরা আফ্রিকার পিগমী বা অস্ট্রেলিয়ার অ্যাপেরিজিনদের মতো দেশজ বা মাটির কাছের মানুষদের কাছ থেকে যারা প্যালিওলিথিক মানুষদের মতো শিকারী সমাজে বাস করে এবং কৃষিবিপ্লবের অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, তাদের কাছ থেকে অনেকাংশে জানতে পারি।

প্রতীক ও পুরাণের আঙ্গিকে এসব দেশজ মানুষের চিন্তা করাটা স্বাভাবিক কারণ, নৃতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীদের কল্যাণে আমরা জানতে পারি তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে দৈবের মাত্রা সম্বন্ধে খুব বেশিমাত্রায় সচেতন। শিল্পায়িত শহুরে সমাজের নারী পুরুষের জীবনে আমরা যাকে দিব্য অভিজ্ঞতা বলি সেটা এখন কল্পনায় পরিণত হয়েছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিকট এটা যে কেবল স্বতঃসিদ্ধ তাই না বস্তুজগতের চাইতে সেটা অনেক বেশি বাস্তব। 'স্বপ্নসময়' (dreamtime)– ঘুমের ভিতরে অস্ট্রেলিয়ানরা যা অনুভব করে এবং স্বপ্নাবির্ভাবের মুহূর্ত– সময়নিরপেক্ষ এবং 'সতত'। আটপৌরে জীবনে এটা স্থায়ী প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি করে, মৃত্যু, দুর্দশাসহ অন্তহীন ঘটনার আনাগোনায় এবং ঋতুর পটপরিবর্তনে যা জর্জরিত। স্বপ্নসময়ে পূর্ব-পুরুষদের আনাগোনা–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিশালী, অস্তিত্বের আদিরূপ যারা মানুষকে বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে যেমন শিকারের কৌশল, যুদ্ধের নীতি, বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া, কাপড় বয়ন এবং ঝুড়ি তৈরি। এসব কাজ, সেই কারণে, লৌকিক না বরং পবিত্র কর্মকাণ্ড যা নশ্বর নারী পুরুষকে স্বপ্নসময়ের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। যেমন ধরা যাক, কোনো অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসী যখন শিকার করতে যায়, প্রথম শিকারীর আচরণ সে এমনভাবে অনুসরণ করে তার প্রতিরূপ তৈরি করে যে সে নিজের মাঝে তাকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করে, পৃথিবীর শক্তিশালী আদিরূপের মাঝে সে যেন দ্রবীভূত হয়ে যায়। স্বপ্নসময়ের সাথে যখন সে এই প্রকার অতীন্দ্রিয় একাত্মতা অনুভব করে কেবল তখনই তার জীবনও যে অর্থবহ সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এর পরেই আদি বিশুদ্ধতা থেকে তার পতন ঘটে এবং সে তার বর্তমান সময়ে ফিরে আসে যা তাকে গ্রাস করে তার সমস্ত অর্জন নিমেষে বিনাশ করবে এই ভয়ে সে তখন অস্থির হয়ে উঠে।[৩]

আধ্যাত্মিক জগৎ এমন উপস্থায়ী আর তীব্র যে আদিবাসী মানুষেরা বিশ্বাস করে, এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষের অভিগম্যতা ছিল অনেক বেশি। প্রতিটি সংস্কৃতিতে আমরা হারিয়ে যাওয়া স্বর্গ সম্বন্ধিত একটা পুরাণ দেখতে পাই, সেখানে মানুষ দিব্য সত্তার সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ আটপৌরে, জীবনযাপন করত। তারা ছিল অমর এবং প্রকৃতি আর তার পশুপাখির সাথে মিলেমিশে তারা শান্তিতে বসবাস করতো। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটা গাছ, পাহাড় বা খুঁটি, স্বর্গ আর মর্ত্যকে একসাথে জুড়ে রেখেছিল, যা বেয়ে মানুষ সহজেই দেবতার সন্নিকটে পৌছাতে পারত। তারপরে আসে এক ঘোর দুর্যোগ, পাহাড় বিচূর্ণ হয়, গাছ উপড়ে যায় এবং স্বর্গে পৌছানো তখন কঠিন হয়ে পড়ে। স্বর্ণযুগের গল্প, খুব প্রাচীন এবং বিশ্বজনীন এক পুরাণ যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। পবিত্রতার তীব্র অনুভূতি থেকে এর উৎপত্তি যা মানুষের সহজাত এবং বাস্তবতার অনুভূতি সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে যা প্রায় বাস্তব এবং আয়ত্তের সামান্য বাইরে। বেশির ভাগ প্রাচীন সমাজের ধর্ম এবং পুরাণ হারানো স্বর্গ ফিরে পাবার বাসনায় সিক্ত।[৪] যদিও পুরাণ নষ্টালজিয়ার সাধারণ কোনো কসরত না। পুরাণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো কিভাবে আদর্শ পৃথিবীতে আবার ফিরে যাওয়া যায় মানুষকে সেই পথ দেখানো, দিব্যদৃষ্টির মগ্নতার মাধ্যমে না বরং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নৈমিত্তিক দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়ে।

আমরা বর্তমানে ধর্মকে লোকায়ত থেকে আলাদা করে ফেলেছি। প্যালিওলিথিক শিকারীদের কাছে বিষয়টা অকল্পনীয় ছিল, যাদের কাছে লোকায়ত বা ইহজাগতিক বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তারা যা দেখতো বা অনুভব করতো সবই ছিল দিব্যজগতের স্বচ্ছ প্রতিমূর্তি। কোনোকিছু, তা সে যতই ইতর বা হীন হোক না কেন, পবিত্রতাকে ধারণ করতে পারতো।[৫] তাদের আচরিত সব কাজই ছিল অপসুদীক্ষার মতো যা তাদের দেবতাদের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। বেশির ভাগ সাধারণ কর্মকাণ্ড ছিল আনুষ্ঠানিক যা নশ্বর আত্মাকে চিরন্তন পৃথিবীর সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করতো। আমাদের মতো আধুনিকদের কাছে, কোনো প্রতীক বিমূর্ত বাস্তবতা থেকে স্বভাবতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাদা, যার প্রতি সেই প্রতীক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু গ্রীক symballein শব্দের মানে 'একসাথে নিক্ষেপ করা' : এখানে দুটো অসম বস্তুর অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠা বোঝানো হয়েছে– ঠিক যেমন ডিসপ্রিন পানিতে দ্রবীভূত হয়। তুমি যখন কোনো পার্থিব বস্তুর কথা গভীরভাবে চিন্তা করো, এর ঐশ্বরিক প্রতিরূপের উপস্থিতিতে তুমি সেটা করো। দিব্যতার সন্নিবেশের এই বোধটা পুরাণের বিশ্ব-বীক্ষার ক্ষেত্রে জরুরী : আধ্যাত্মিক মাত্রা সম্বন্ধে মানুষকে বেশি করে সজাগ করে তোলাটাই পুরাণের উদ্দেশ্য যে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং জীবনের একটা স্বাভাবিক অংশ।

একেবারে প্রথমদিকের পুরাণগুলো মানুষকে পার্থিব জগতের মাঝ দিয়ে এমন একটা বাস্তবতা দেখাতে চাইতো যাতে মনে হবে অন্যকিছু একটা[৬] এর মধ্যে আরোপিত রয়েছে– কিন্তু এটা করতে বিশ্বাসের জোর দরকার হতো না কারণ এই পর্বে পবিত্র আর লোকায়তের মাঝে কোনো বিমূর্ত দূরত্ব বিরাজমান ছিল না। এসব প্রাচীন মানুষ যখন কোনো পাথরের দিকে দেখত, তারা সেটাকে কেবল অচেতন কোনো জড় পদার্থ বলে ভাবতো না। শক্তি, স্থায়িত্ব, একতা আর অস্তিত্বের একটা পরম মাত্রা হিসাবে পাথরটা প্রতিভাত হতো যা মানুষের ঘাতোপযোগী পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পাথরের এই স্বতন্ত্রতাই তার পবিত্র বলে পরিগণিত হবার কারণ। পাথর কৃত্যানুষ্ঠানের একটা সাধারণ ধারক– পবিত্রতার বিস্ময়কর প্রকাশ প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্র। অথবা, একটা গাছ, যার অনায়াসে নিজেকে নবীন, পুনরুত্থিত করার শক্তি রয়েছে এবং দৃশ্যমান এই ক্ষমতা এক অলৌকিক প্রাণশক্তি মরণশীল নারী পুরুষের যাতে কোনো অধিকার নেই। চাঁদের ক্ষয় হওয়া যখন তারা দেখে, তখন পুনর্জন্মের পবিত্র উদাহরণ হিসাবে একে বিবেচনা করে,[৭] নিয়মের অলঙ্ঘনীয় নজির যা একাধারে কঠোর আবার করুণাময় এবং ভীতিকর আবার সেই সাথে প্রশান্তিদায়ক। গাছ, পাথর, কিংবা দিব্য সত্তা কখনও তাদের উপাসনার বস্তু ছিল না কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা করা হতো কারণ তারা ছিল একটা গোপন শক্তির প্রকাশবার্তা যা সব প্রাকৃতিক বস্তুর ভিতর প্রচণ্ডভাবে প্রতিভাত হয়ে মানুষকে আরেকটা প্রভবিষ্ণু বাস্তবতার ইঙ্গিত প্রদান করতো।

সভ্যতার একেবারে শুরুর দিকের কিছু পুরাণ, যা সম্ভবত প্যালিওলিথিক যুগের চেয়েও প্রাচীন, আকাশের সাথে সম্বন্ধিত, যা মানুষকে সম্ভবত পবিত্রতার প্রথম ধারণা দিয়েছিল। তারা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো– তাদের ক্ষুদ্র প্রাণ থেকে বহুদূরে অনন্ত অসীমে বিরাজমান– তাদের মনের ভিতরে একটা ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হতো।[৮] তাদের মাথার উপরে বিরাজমান প্রবল আকাশ, যার বিশালতা তাদের বোধগম্যতার অতীত এবং অনন্ত। সর্বব্যাপী আর স্বতন্ত্রতাইএর মূল নির্যাস। মানুষের পক্ষে এ দুটো জিনিসকে প্রভাবিত করা অসম্ভব। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, গ্রহণ, সূর্যাস্ত, রঙধনু এবং উল্কাপাতের শেষ না হওয়া নাটকই অন্য আরেকটা অনন্ত সক্রিয় যাত্রার কথা বলে যার নিজস্ব একটা গতিশীল জীবন রয়েছে। আকাশের কথা চিন্তা করে মানুষ কখনও হত ভীত কখনও আনন্দিত আবার কখনওবা আতঙ্কিত কখনওবা উদ্বিগ্ন। আকাশ কখনও তাদের আকর্ষণ করতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও বীতস্পৃহা জন্মাত। রুডলক ওট্টো, ধর্মতত্ত্বের মহান ঐতিহাসিক বলেছেন, এর প্রকৃতিই ভয় ও শক্তির উদ্রেককারী। কোনো কল্পিত দেবীর অধিষ্ঠান ব্যতীত আকাশ নিজেই হলো mysterium tremendum terribile et fascinans?"

পৌরাণিক ও ধর্মীয় চেতনা উভয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সাথে এভাবেই আমরা ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠি। আমাদের সন্দেহপ্রবণ বয়েসে, আমরা প্রায়শই ভেবে নিতাম মানুষ ধার্মিক কারণ তারা যে দেবতার আরাধনা করে তার কাছ থেকে তারা প্রতিদানে কিছু চায়। তারা চেষ্টা করে শক্তির বরাভয় যেন তাদের উপরেই বর্ষিত হয়। তারা চায় দীর্ঘ জীবন, রোগমুক্তি আর অমরত্ব এবং চিন্তা করে যে দেবতাকে তারা রাজি করাতে পারবে তাদের এসব বর প্রদানে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এইসব অতি প্রাচীন পৌরাণিক ব্যাখ্যায় আমরা দেখতে পাই উপাসনায় সব সময়ে নিজের বরাভয়ের উপলক্ষটা জরুরী না। মানুষ আকাশের কাছ থেকে কিছু চায় না এবং স্পষ্টতই জানতো কোনোভাবেই আকাশকে তারা প্রভাবিত করতে পারবে না। সুপ্রাচীন কাল থেকেই, আমরা পৃথিবীকে ভীষণ রহস্যময় হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত; ত্রাস আর বিস্ময়ের যুগলবন্দির সাহায্যে সে আমাদের আটকে রাখে যা কিনা আবার উপাসনার মূলসুর। পরবর্তীকালে ইসরায়েলের জনগোষ্ঠী ঐশ্বরিক কিছু বোঝাতে qaddosh শব্দটা ব্যবহার করেছে। এর মানে 'পৃথক, আলাদা'। শুদ্ধ ভাবোন্মাদনা নিজেই একটা সন্ত্রষ্টিকর অভিজ্ঞতা যা এমন কিছু সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে, যা তাদের আপন সত্তাকে পুরোপুরি ছাপিয়ে যেতে পারে, এবং তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে অনুভূতি আর কল্পনার রাশ আলগা করে দিয়ে মানুষকে পরমানন্দের অভিজ্ঞতা এনে দেয়। এটা অচিন্তনীয় যে দুস্থ দুর্বল মানুষের ইচ্ছাকে আকাশ প্ররোচিত করতে পারবে।

প্যালিওলিথিক যুগের পরেও বহুকাল আকাশ পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু সুপ্রাচীন কালেই একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠে যে পুরাণ যদি এমন কোনো বাস্তবতার কথা বলে যা নিজেই বড্ড সর্বব্যাপী তবে সেই পুরাণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। পুরাণ যদি মানুষকে ঐশ্বরিকতার সাথে কোনোভাবে শরিক করতে না পারে তবে তা তাদের চেতনা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে একটা পর্যায়ে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। কোনো একটা পর্যায়ে– আমরা জানি না ঠিক কখন ব্যাপারটা ঘটেছিল– পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জনগোষ্ঠী আকাশের মাঝে মানবিক গুণাবলী আরোপ করতে শুরু করেছিল। তারা 'আকাশ দেবতা' বা 'উর্ধ্বদেব' এদের নিয়ে গল্প বলতে শুরু করে, যিনি একাকী শূন্য থেকে স্বর্গ আর মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন। এই প্রাচীন একেশ্বরবাদ প্রায় নিশ্চিতরূপেই প্যালিওলিথিক পর্বের। অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা শুরু করার আগে, পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষ, কেবল একজন মহান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিল যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং দূর থেকে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রায় প্রতিটি সর্বদেবতার মন্দিরের নিজস্ব আকাশ দেবতা রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদেরা ফুজির আদিবাসী, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং পিগমীদের মতো জনগোষ্ঠীর মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।[১০] সব বস্তুর তিনিই মূল / প্রথম কারণ এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের শাসক। কোনো প্রতিমূর্তি বা প্রতিমা দ্বারা তাঁকে কখনও উপস্থাপন করা হয়নি এবং তাঁর কোনো পুরোহিত বা মন্দির নেই কারণ মানুষের প্রথাগত প্রার্থনায় তার প্রশংসা করা সম্ভব না। মানুষ ঊর্ধ্ব ঈশ্বরের প্রার্থনার সময় তাঁর প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, বিশ্বাস করে যে তিনি উপর থেকে তাদের দেখছেন এবং খারাপ কাজ করলে শাস্তি দেবেন। কিন্তু তারপরেও তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তিনি অনুপস্থিত। আদিবাসী মানুষদের ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করা অসম্ভব এবং পৃথিবীর মানুষের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তিনি ব্যগ্র নন। দুর্যোগের সময়ে তাঁরা তার স্মরণাপন্ন হতে পারে কিন্তু অন্য সময়ে তিনি অনুপস্থিত থাকেন এবং প্রায়শই বলা হয় 'চলে গেছেন' বা 'অদৃশ্য হয়েছেন'।

প্রাচীন পারস্য, বৈদিক ভারত এবং গ্রীক ও ক্যানানাইটদের আকাশ ঈশ্বর এভাবেই বিলীন হয়ে গেছেন। এসব জনগোষ্ঠীর পুরাণ, ঊর্ধ্বঈশ্বর, বড়জোর একটা আবছায়া, শক্তিহীন দেবতা, সর্বদেবতার দিব্য উপস্থিতির মাঝে তাঁর অবস্থান খুব সাধারণ এবং ইন্দ্র, অনীল, বাআল এদের মতো প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয় আর অভিগম্যরাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। ঊর্ধ্ব ঈশ্বর কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন সেটা ব্যাখ্যা করে গল্প প্রচলিত আছে : যেমন, গ্রীকদের, আকাশ দেবতা ওরানস তার ক্ষমতা হরণ করে তারই ছেলে ক্রোনস, পুরাণে এসব নপুংসক স্রষ্টাদের খুব ভয়াবহভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে তারা মানুষের প্রাত্যহিক জীবন থেকে দূরে এতটাই দূরে সরে গিয়েছে যে একটা সময়ে প্রান্তিক অবস্থার শিকার হয়েছেন। প্রতিবার বৃষ্টিপাতের সময়ে মানুষ বাআলের দিব্য ক্ষমতা অনুভব করে; যুদ্ধের সর্বব্যাপী চণ্ডতা তাদের যতবারই আচ্ছন্ন করে ফেলে ততবারই ইন্দ্রের ক্ষমতা তাদের গোচরীভূত হয়। কিন্তু বুড়ো আকাশ দেবতা আর মানুষের জীবনকে সেভাবে ছুঁয়ে যায় না। এসব প্রাচীন লোককথা একটা বিষয় পরিষ্কার করে দেয় যে পুরাণ যদি খুব বেশিমাত্রায় আধিদৈবিক নির্ভর হয় তবে সেটা সফল হতে পারে না; মানবতার সাথে সম্পৃক্ত পুরাণই কেবল গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

আকাশদেবতার নিয়তি আমাদের আরেকটা ভ্রান্ত কিন্তু লোকপ্রিয় ধারণার কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা প্রায়ই ধরে নেয়া হয় যে, প্রাচীন পুরাণসমূহ প্রাক বিজ্ঞান যুগে মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃচনা সম্পর্কে অবহিত করতো। আকাশদেবতার গল্প ঠিক এধরনেরই অনুমানের কথা উপস্থাপন করে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এটা একটা ব্যর্থ পুরাণ, মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে বা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনো সমস্যার সমাধানে এটা সাহায্য করতে অপারগ। আকাশ দেবতার দুর্দশাই আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করাটা সহজ করে দেয় কেন মুসলমান, খ্রিস্টান আর ইহুদিদের উপাস্য স্রষ্টা ঈশ্বর, কেন পশ্চিমের বহু মানুষের জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পুরাণ কখনও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দেয় না বরং এটা আচরণের একটা প্রাথমিক বিধিবিধান। আচরিত হলেই কেবল এর অন্তর্নিহিত সত্যটা প্রতিভাত হবে, তা সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিগতভাবেই হোক বা প্রথাগতভাবেই হোক। এটাকে যদি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো উপপ্রমেয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে এটা বিরল, আর অবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

ঊর্ধ্বদেবতা হতে পারে মর্যাদা হারিয়েছে কিন্তু আকাশ আজও মানুষকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পবিত্রতার পৌরাণিক প্রতীক হিসাবে উচ্চতা টিকে আছে– প্যালিওলিথিক আধ্যাত্মিকতার স্মারক হিসাবে। পুরাণ এবং মরমীবাদে নারী এবং পুরুষ উভয়েই আকাশকে ছুঁতে চেষ্টা করেছে এবং স্বপ্নযান এবং একাগ্রতার নানা তরিকা এবং পদ্ধতির জন্ম দিয়েছেন যাতে আরোহণের এই সমস্ত গল্পকে আচরিত পর্যায়ে নিয়ে এসে চেতনার উন্নততর 'স্তরে' 'আরোহণ' করা যায়। সাধুসন্তরা দাবী করেন যে দিব্য মণ্ডলে আরোহণের পূর্বে তারা দিব্য পৃথিবীর নানা স্তরের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছেন। বলা হয়ে থাকে যোগীরা শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে। মরমীবাদীরা দেহকে শূন্যে উত্থিত করতে পারে, নবীরা পাহাড় ডিঙিয়েছেন এবং অস্তিত্বের আরো মহত্তর মাত্রায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।[১১] মানুষ যখন আকাশের সর্বব্যাপী বিস্তারের কারণে তার পানে ধাবিত হয়, তারা অনুভব করে যে মানুষেরা নশ্বরতা অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে। সেই কারণে প্রায়শই পুরাণে পাহাড়কে পবিত্র জ্ঞান করা হয়েছে : স্বর্গ আর মর্ত্যের মধ্যবর্তী একটা স্থান, যেখানে মূসা (আ:)-এঁর মতো লোকেরা তাদের ঈশ্বরের দেখা পান। সব সংস্কৃতিতেই আরোহণ সম্পর্কীয় পুরাণ লক্ষ্য করা যায়, সব কিছুকে অতিক্রম করার, ছাপিয়ে যাবার একটা বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষ জন্মের নানা বন্ধন থেকে মুক্তি। পুরাণকে কখনও আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া উচিত না। আমরা যখন পড়ি যে যীশু খ্রিস্ট স্বর্গে আরোহণ করেছেন তখন সূর্যমণ্ডলের ভিতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি উঠে যাচ্ছেন কল্পনা করাটা আমাদের উচিত হবে না। মহানবী (স:) যখন মক্কা থেকে জেরুজালেমে উড়ে আসেন এবং তারপরে একটা সিঁড়ি বেয়ে আল্লাহ্‌র আরশে পৌছান, আমাদের বুঝতে হবে যে আধ্যাত্মিকতার একটা ভিন্ন উচ্চতর মাত্রায় তিনি আরোহণ করেছেন। নবী এলিজাহ্ (রা:) যখন আগুনের রথে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করেন, তিনি মানুষের নশ্বরতা পিছনে ফেলে যান এবং পার্থিব অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে যে পবিত্র দিব্য অঞ্চল সেখানে পৌছান।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আরোহণ সম্পর্কিত প্রথম পুরাণটার জন্ম প্যালিওলিথিক পর্বে এবং তা শামান নামে একজনের সাথে সম্পর্কিত, শিকারী সমাজের প্রধান ধর্মীয় আচার্য্য। তিনি ছিলেন পরমানন্দ আর স্বপ্নপ্রয়াণের গুরু, যার স্বপ্ন আর দূরদৃষ্টি শিকারের মূল্যবোধগুলোকে একটা ভিত্তি দিয়েছে এবং এর প্রতি একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ করেছে। শিকার ছিল মারাত্মক বিপদসঙ্কুল। শিকারের প্রয়োজনে শিকারীদের অনেকদিন বাইরে কাটাতে হয়, গুহার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত করে এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা তাঁদের লোকদের জন্য খাবার সংগ্রহ করে আনতো। কিন্তু, আমরা এখন দেখবো যে, এটা কেবল একটা প্রয়োগবাদী অভিযান না, তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মতো এরও একটা সর্বব্যাপী মাত্রা রয়েছে। গুরু শামানও একটা অভিযানে নেমেছেন, কিন্তু তার এ অভিযান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধ্যাত্মিকতার। এটা অনুমান করা হয় যে নিজের দেহ ত্যাগ করার ক্ষমতা তার ছিল এবং তার আত্মা স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে ঘুরে বেড়াত। তিনি যখন স্বপ্নপ্রয়াণ অবস্থায় থাকতেন তখন বাতাসে ভেসে যেতে পারতেন এবং নিজের লোকদের ভালোমন্দ নিয়ে দেবতাদের সাথে অন্তরঙ্গ আলাপ করতেন।

স্পেনের আলতামিরা এবং ফ্রান্সের লাসাউক্সে অবস্থিত প্যালিওলিথিক গুহা মন্দিরে, আমরা শিকারের চিত্র অঙ্কিত দেখতে পাই; বন্য পশু আর শিকারী পাশাপাশি, মানুষগুলোর মুখে পাখির মুখোশ উড্ডয়নের ইঙ্গিতবহ, সম্ভবত তারাই শামান। এমনকি আজও, সাইবেরিয়া থেকে টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর শিকারী গোষ্ঠীর, শামানরা বিশ্বাস করে যে তারা যখন স্বপ্নপ্রয়াণে থাকে তখন তারা স্বর্গে আরোহণ করে এবং দেবতাদের সাথে কথা বলে, বহুকাল আগে স্বর্ণযুগে মানুষেরা যেমন করে থাকত। পরমানন্দ অর্জনের ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতির ব্যাপারে শামানদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বয়ঃসন্ধিক্ষণে সে কখনও চিত্তবৈকল্যে আক্রান্ত হতো যা তার পুরাণ লোকায়ত চেতনার প্রতি প্রবল বৈরাগ্য এবং প্রাচীন মানুষদের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু যা আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, তার পুনরুদ্ধার। ঢাকঢোল সহযোগে শামান স্বপ্নপ্রয়াণ দশাপ্রাপ্ত হতো বিশেষ আচারানুষ্ঠান পর্বে। কখনও সে একটা গাছ বা লম্বা খুঁটি বেয়ে উপরে উঠে যা একসময় স্বর্গ ও মর্ত্য সংযোগকারী পাহাড়, গাছ বা সিঁড়ির প্রতীকী আরোপণ।[১২] পৃথিবীর গভীরতার ভিতর দিয়ে স্বর্গে যাবার ঘটনা বর্ণনা করেছে আধুনিককালের এক শামান :

মানুষ যখন গান গায়, আমি নাচি। আমি পৃথিবীর উদরে প্রবেশ করি। আমি একটা জায়গায় যাই, মানুষ বসে পানি পান করে অনেকটা সেরকম জায়গাটা। আমি বহুদূর ভ্রমণ করি, অনেক দূর... যখন আমি আবির্ভূত হই, তখনই আমি উঠতে শুরু করেছি। দক্ষিণে ঝুলে থাকা সুতো, সেই সুতো বেয়ে আমি উঠছি... এবং তুমি অবশেষে যখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছাও, তুমি নিজেকে খুব দীন করে তোলো। তারপরে সেখানে কর্ম সমাধা করে তুমি অন্যেরা যেখানে রয়েছে সেখানে ফিরে আসো।[১৩]

শিকারীদের বিপদসঙ্কুল অভিযানের মতো, শামানও মৃত্যুর মোকাবেলা করে। সে যখন তার লোকদের কাছে ফিরে আসে এবং তার সঙ্গীসাথীরা তাকে সুস্থ করে তোলে তারা 'তোমার মাথা তুলে ধরে এবং মুখের এক পাশে ফু দেয়। এভাবেই তুমি আবারও বেঁচে উঠো। বন্ধুরা যদি তোমাকে ফু না দিত তবে তুমি মারা পড়তে... তুমি নিশ্চিত মারা যেতে, এবং মৃত বলে ঘোষণা করা হতো তোমাকে।'[১৪]

আধ্যাত্মিক উর্ধ্বচর্চা শারীরিক ভ্রমণের সাথে জড়িত না, কিন্তু একটা পরমানন্দের অনুভূতি যখন মনে হবে আত্মা দেহচ্যুত হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবরোহণ ব্যতীত স্বর্গের গৌরবে আরোহণ করা যায় না। পৃথিবীর সব সংস্কৃতির মরমীবাদী সাধু আর যোগীদের আত্মিক অনুসন্ধানে এই একই প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সুর ঘুরে ঘুরে এসেছে। মানুষের ইতিহাসের সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত এসব পুরাণ এবং আরোহণের আচারঅনুষ্ঠানের এই উপস্থিতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে মানবতার অন্যতম আকুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো মানবিক অবস্থার উর্ধ্বে উঠার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ বিবর্তনের প্রক্রিয়া শেষ করার সাথে সাথে, তারা দেখতে পায় ছাপিয়ে যাবার ছড়িয়ে পড়ার একটা আকাঙ্ক্ষা তাদের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

শিকারী সবগোষ্ঠীতেই আমরা কেবল শামানদের উপস্থিতি খুঁজে পাই এবং তাদের আধ্যাত্মিকতায় পশু একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। প্রশিক্ষণের সময়, আধুনিককালের শামানকে একটা পর্যায়ে কখনও বনে জন্তুদের সাথে কাটাতে হয়। আশা করা হয় এ পর্যায়ে কোনো একটা জন্তুর সাথে তার দেখা হবে যে তাকে পরমানন্দের গূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে অবহিত করবে, পশুদের ভাষা শেখাবে এবং তার সব সময়ের সহচরে পরিণত হবে। এটাকে কোনো মতেই প্রত্যাবৃত্তি বলা যাবে না। শিকারী সমাজে, পশুকে কখনও নিকৃষ্ট জীব হিসাবে দেখা হয় না বরং তাদের প্রাজ্ঞতার অধিকারী হিসাবে দেখা হয়। অমরত্ব আর দীর্ঘায়ুর রহস্য তারা জানে, এবং তাদের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে শামান একটা উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। স্বর্ণ যুগে, মর্যাদাচ্যুত হবার আগে, ভাবা হতো যে মানুষ জীবজন্তুর সাথে কথা বলতে পারতো এবং যতক্ষণ না সে এই বিস্মৃতবিদ্যায় পুনরায় দক্ষ না হয়ে উঠবে ততক্ষণ একজন শামান দিব্য জগতে অবতীর্ণ হতে পারবে না।[১৫] কিন্তু তার এই অভিযানের আরেকটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। শিকারীদের মতো, সেও তার লোকদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে। যেমন, গ্রীনল্যান্ডের কথাই ধরা যাক, এস্কিমোরা বিশ্বাস করে এক বিশেষ দেবীর রক্ষিতা হলো সীল আর তাই তাকে জীবজগতের দয়িতা বলা হয়। যখনই শিকারের অভাব দেখা দেয় তখনই শামানকে পাঠানো হয় তাকে সন্তুষ্ট করতে যাতে মন্দাভাব কেটে যায়।[১৬]

প্যালিওলিথিক পর্বের মানুষদের এমন পুরাণ আর রীতিনীতি ছিল এমনটা হতেই পারে। হোমো স্যাপিয়েন্সরাই যে আবার 'শিকারী বনমানুষ এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, যারা অন্য জন্তুদের শিকার করে, তাদের হত্যা করে ভক্ষণ করে।[১৭] প্যালিওলিথিক পুরাণে জন্তুদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হয়েছে তাই মানুষ এখন তাদের হত্যা করতে বিব্রত বোধ করে। শিকার করার জন্য মানুষের অস্ত্র বাড়ন্ত, কারণ তারা তাদের শিকারের চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি এবং দুর্বল। এটা কাটাতে তাদের নতুন আয়ুধ আর তরিকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই সাথে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো বেশ সমস্যাবহুল বলে প্রতীয়মান হয়। নৃতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করেছেন যে আজকের আদিবাসী মানুষেরা পশু পাখিকে হরহামেশাই নিজেদের সমগোত্রীয় 'মানুষ' বলে অভিহিত করে। তারা মানুষের পশুতে পরিণত হবার বা বিপরীতটা সংঘটিত হবার গল্প বলে ও তাদের কাছে পশু হত্যা একজন বন্ধুকে হত্যা করার মতোই, তাই আদিবাসী শিকারীর দল সফল শিকার অভিযান শেষে মনঃকষ্টে ভুগে থাকে। পবিত্র কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচিত হবার কারণে এবং উচ্চকোটির উদ্বেগ জড়িয়ে থাকার কারণে শিকারকে ভাবগম্ভীর আনুষ্ঠানিকতায় ভূষিত করা হয়েছে এবং একে কেন্দ্র করে নানা রীতিনীতি ও টাবু গড়ে উঠেছে। শিকারের আগে, শিকারীকে অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রথাগত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের অর্জিত শুদ্ধতা বজায় রাখবে; শিকার শেষে, হাড় থেকে মাংস নিকিয়ে নেয়া হবে এবং তারপরে চামড়ার উপরে খুলি ও পুরো কঙ্কাল যত্নের সাথে বিছানো হবে তাকে পুনরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং তাকে নতুন জীবন দান করবে।[১৮]

ধারণা করা হয়, সভ্যতার উষালগ্নের প্রথম শিকারীদের অনুরূপ বোধ কাজ করতো। অনেক চাপানউতোর পার হতে হয়েছে তাদের। কৃষিপূর্ব যুগে, তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপন্ন করতে জানত না, তাই নিজের জীবন বাঁচাতে যাদের তারা নিজেদের সমগোত্রীয় মনে করতো তাদের বিনাশ করতে হয়েছে। তাদের প্রধান শিকার ছিল অতিকায় আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, যাদের শরীর আর মুখের অভিব্যক্তি তাদের সাথে মিলে। তাদের ভয় শিকারীর দল দেখতে পেত এবং তাদের আতঙ্কিত চিৎকারের সাথে একাত্মতা বোধ করতো। মানুষের মতো প্রবাহিত হয় তাদের রক্তধারা। এই অসহ্য অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তারা পুরাণ আর আচার অনুষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে যাতে সমগোত্রীয় প্রাণী হত্যা করার সাথে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে, যার কিছু কিছু পরবর্তীকালের পুরাণে টিকে আছে। প্যালিওলিথিক যুগের পরেও মানুষ বন্যপ্রাণী হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করাটা সহজভাবে নিতে পারেনি। প্রাচীনকালে প্রায় সব ধর্মীয় ব্যবস্থায় পশু বলি দেয়াটা ছিল প্রধান রীতি যা প্রাচীনকালের শিকারের আনুষ্ঠানিকতার স্মারক এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে যেসব প্রাণী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের প্রতি সম্মান জানানো।

পুরাণের প্রথম মহান বিকাশ তাই এমন একটা সময়ে যখন হোমো স্যাপিয়েন্সরা পরিণত হয় homo necans এ 'খুনী মানুষ,' এবং বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে অস্তিত্বের পরিবেশ মেনে নেয়াটা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আক্ষরিক অর্থে ব্যবহারিক সমস্যাজনিত প্রচণ্ড উদ্বেগ থেকে অনেক সময় পুরাণের জন্ম হতে পারে, যা কেবল যুক্তিতর্ক দ্বারা মীমাংসা করা অসম্ভব। শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকার বিষয়টা মানুষ পুষিয়ে নিতে সক্ষম, তাদের অস্বাভাবিক রকমের বড় মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যখন তারা তাদের নিজস্ব শিকারের কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়।

তারা অস্ত্র উদ্ভাবন করে এবং শিখে নেয় কিভাবে দক্ষতার সাথে নিজের সমাজকে সংগঠিত করতে হয় এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করতে হয়। শুরুর এই পর্বেও homo sapiens এর দল, পরবর্তীকালে গ্রীকরা যাকে লোগোস বলে অভিহিত করবে, তার যৌক্তিক বিবর্তন শুরু করেছে, প্রয়োগবাদী এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যা সাফল্যের সাথে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে তাকে সাহায্য করবে।

পৌরাণিক চিন্তাভাবনা থেকে *লোগোস* সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার। পুরাণের মতোই, যুক্তিকেও বস্তুগত ঘটনার সাথে ঠিকঠিক সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বাইরের পরিবেশে আমরা যদি কিছু ঘটনা ঘটাতে চাই তখন আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ব্যবহার করি : যখন আমরা প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা সমাজকে সংগঠিত করতে চাই। পুরাণের মতো, এটাও প্রয়োগবাদী। পার্থক্য একটাই, পুরাণ যেখানে হারানো স্বর্গ বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পবিত্র আদিরূপের কল্পিত পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সেখানে লোগোস সামনে এগিয়ে যায়, সব সময় নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় মগ্ন, সেটা হতে পারে যুগান্তকারী কোনো উদ্ভাবন বা পুরাণ পরিজ্ঞান শানিয়ে নেয়া এবং পরিবেশের উপরে আরো বেশি করে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। যদিও পুরাণ এবং লোগোস উভয়েরই নিজ নিজ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রাক আধুনিক যুগে বেশির ভাগ মানুষ উপলব্ধি করে যে পুরাণ এবং যুক্তি একটা অন্যটার পরিপূরক; প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা মণ্ডল রয়েছে, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যোগ্যতা রয়েছে এবং এই দু'ধরনের চিন্তা পদ্ধতির মানুষের প্রয়োজন আছে। পুরাণ কখনও শিকারীকে বলবে না কিভাবে শিকারকে বধ করতে হবে বা কিভাবে কোনো অভিযান দক্ষতার সাথে সংগঠিত করতে হবে কিন্তু পশু হত্যার জটিল আবেগ শমিত করতে নিজেকে ধাতস্থ হতে সে তাকে সাহায্যে করবে। পক্ষান্তরে লোগোস দক্ষ, বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিনির্ভর কিন্তু মানুষের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নের সে উত্তর দিতে অপারগ বা মানুষের দুঃখকষ্টও সে লাঘব করতে পারে না।[১৯] শুরু থেকেই তাই homo sapiens-এর দল সহজাত প্রবৃত্তির বলেই বুঝে গিয়েছিল যে পুরাণ আর লোগোসের প্রয়োগ ক্ষেত্র ভিন্ন। নতুন আয়ুধের উদ্ভাবনের নিমিত্তে সে *লোগোস* প্রয়োগ করে, এবং পুরাণ– এর সাথে আচরিত কৃত্যানুষ্ঠানের প্রয়োগ করে জীবনের নানা দুঃখজনক ঘটনার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে যা তাকে পুরোপুরি আপ্লুত করে ফেলার মতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যা তাকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে ভূমিকা রাখতে বাধা দিচ্ছে।

আলতামিরা আর লাসাউক্স-এর ভূগর্ভস্থ গুহাসমূহ অসাধারণ প্যালিওলিথিক আধ্যাত্মিকতার একটা ঝলক আজও আমাদের জন্য ধারণ করে রেখেছে।[২০] হরিণ, বাইসন আর লোমঅলা ঘোড়া, পশুর ছদ্মবেশ নেয়া শামানের দল আর বর্শা হাতে শিকারীদের ভক্তি উদ্রেককারী চিত্রগুলো নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ যত্ন আর দক্ষতায় আন্তর্ভৌম সুড়ঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে যেখানে পৌঁছানো খুবই কষ্টসাধ্য। ভূগর্ভস্থ এসব স্থানই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম মন্দির আর গির্জা, এসব গুহার মানে জানতে অজস্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে; চিত্রগুলোয় সম্ভবত স্থানীয় লোককাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা আমরা কখনও জানতে পারবো না। কিন্তু তারা নিশ্চিতভাবে মানুষ আর ঈশ্বরদৃশ্য, আদিরূপ প্রাণীর মাঝে পরম সম্মিলনের একটা দৃশ্যকল্প যা গুহার দেয়াল আর ছাদকে অলংকৃত করেছে। তীর্থযাত্রীকে স্যাঁতসেঁতে এবং বিপজ্জনক সেইসব গুহায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে তবেই তারা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছাতে পারবে। অন্ধকারের গর্ভে মুখ লুকিয়ে থাকা চিত্রিত পশুর দল তবেই দৃষ্টিপটে ধরা দেবে। আমরা এখানেও সেই একই জটিল রূপ এবং ধারণার প্রতিফলন দেখি যা আমাদের শামানের অভিযানের খবর জানিয়েছিল। শামানিক পর্বের মতোই, গুহাতেও বাদ্যবাজনা, নাচ, গান অনুষ্ঠিত হয়েছে, অন্য পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুই হয় পৃথিবীর গর্ভে অবতরণের মাধ্যমে; এবং সেখানে মায়াবী পরিবেশে জীবজন্তুর সাথে তাদের যোগাযোগ হয়, পতিত, নিরানন্দ জগৎ থেকে যা আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবাগতদের জন্য অভিজ্ঞতাটা হয়তো একটু বেশিই জোরালো বিশেষভাবে আগে কখনও যে গুহায় প্রবেশ করেনি এবং মনে হয় যে এই গুহাগুলো গোষ্ঠীর যুবকদের শিকারীতে রূপান্তরিত করতে দীক্ষাদানের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীনকালে দীক্ষাদানের অনুষ্ঠানই ছিল ধর্মের মূল বিষয় এবং আজকের প্রথাবদ্ধ সমাজেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে।[২১] আজও আদিবাসী সমাজে, সদ্যযুবকদের তাদের মায়ের কাছ থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে বাধ্য করা হয় সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে যাতে তারা মানুষে গোত্রান্তরিত হতে পারে। শামানদের যাত্রার মতো, এটাও মৃত্যু আর পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া : বালককে তার শৈশব হত্যা করে প্রাপ্তবয়স্কের দায়িত্বপূর্ণ পৃথিবীতে প্রবেশ করতে হবে। উপনয়নের স্মারকসমূহ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় বা সমাধি দেয়া হয়; তাদের বলা হয় এখন একটা দানব তাদের গ্রাস করবে বা একটা আত্মা তাদের হত্যা করবে। তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা আর অন্ধকারে তাদের রাখা হয়, এসময় সাধারণত তাদের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ বা গায়ে উল্কি আঁকা হয়। অভিজ্ঞতাটা এতটাই তীব্র আর স্মরণীয় যে একবারের দীক্ষায় সবকিছু চিরতরে বদলে যায়। মনোবিদরা আমাদের বলেন যে এ ধরনের একাকিত্ব আর বঞ্চনা ব্যক্তিত্বের ভিতরে যে কেবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাই না ব্যক্তির মাঝে সুপ্ত সৃষ্টিশীলতাও জাগ্রত হতে পারে। সহিষ্ণুতার পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে কিশোরকে জানানো হয় যে মৃত্যু মানে একটা নতুন সূচনা। পুরুষের দেহ আর সত্তা নিয়ে সে তার লোকদের মাঝে ফিরে আসে। মৃত্যুর সমূহ সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে এবং অস্তিত্বের নতুন মাত্রায় আরোহণের এটা কেবলমাত্র একটা প্রক্রিয়া এটা জানার পরে, শিকারী বা যোদ্ধায় পরিণত হয়ে সে তার গোষ্ঠীর লোকদের রক্ষার জন্য তখন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়ে উঠবে।

দীক্ষাদান পর্বের কোনো একটা সময়ে নবদীক্ষিত প্রথমবারের মতো নিজের গোত্রের সবচেয়ে পবিত্র পুরাণ শ্রবণ করে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। পুরাণ কোনো গল্প না যে কোনো লোকায়ত বা অকিঞ্চিৎকর পরিবেশে তা উচ্চারিত হবে। এর সাথে যেহেতু পবিত্র জ্ঞানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে তাই সবসময়ে কৃত্যানুষ্ঠানের আবহে এটাকে পুনরায় স্মরণ করা হয়, যা তাকে সাধারণ লৌকিক অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা মাত্রা দেয় এবং আত্মিক আর মানসিক রূপান্তরের পবিত্র প্রেক্ষাপটেই যা কেবল অনুধাবন করা সম্ভব।[২২] পুরাণ হলো সেই উপদেশ যা আমাদের চরম মাত্রায় প্রয়োজন। একটা পুরাণ আমাদের চিরতরে বদলে দেবে এটার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কৃত্যানুষ্ঠানের সাথে মিলিত হয়ে যা গল্প আর শ্রোতার মধ্যবর্তী অন্তরায় দূর করে এবং নিজের করে নিতে যা তাকে সাহায্য করে, পৌরাণিক আখ্যানসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যা আমাদের পরিচিত জগতের নিরাপদ নিশ্চয়তা থেকে অজ্ঞাত জগতে ঠেলে দেবে। রূপান্তরের কৃত্যানুষ্ঠান সমূহ পালন না করে পুরাণ পাঠ অনেকটা বাজনা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার মতো অসম্পূর্ণ। মৃত্যু এবং নবজন্ম, পুনরুত্থানের প্রক্রিয়ার একটা অংশ হিসাবে না দেখলে, পুরাণের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। লাসাউক্সের মন্দিরের কৃত্যানুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থেকে, এবং শিকার এবং শামানদের অভিজ্ঞতা থেকে, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়. যে নায়কদের জন্যেই পুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। শিকারী, শামান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নবদীক্ষিতের দল সবাইকে পরিচিত পরিবেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভীতিকর অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করতে হয়েছে। নিজের যূথবদ্ধ সমাজকে সমৃদ্ধ করার অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে আসবার আগে তাদের নৃশংস মৃত্যুর সম্ভাবনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বীরোচিত অভিযান সম্পর্কে সব সংস্কৃতিতেই প্রায় একই ধরনের পুরাণ রয়েছে। নায়ক তার নিজের জীবনে বা সমাজে কোনো একটা উপাদানের ঘাটতি অনুভব করেন। পুরাতন যে মূল্যবোধ বংশপরম্পরায় তাঁর লোকদের আত্মিক উন্নতি সাধন করেছে সেসব তাঁর কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তাই সে ঘর ছাড়ে এবং বিপদসঙ্কুল অভিজ্ঞতা সহ্য করে। সে দানবদের সাথে লড়াই করে। দূরতিক্রম্য পাহাড় টপকে যায়, নিকষ অন্ধকার জঙ্গল অতিক্রম করে এবং এই প্রক্রিয়ার মাঝে তার পুরাতন সত্তার বিলুপ্তি ঘটে এবং নতুন অন্তর্জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করে সে তার জনগোষ্ঠীর কাছে ফিরে আসে। মানবতার জন্য প্রমিথিউস দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলো, এবং সে কারণে বহু শতাব্দী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে; এনিয়াস বাধ্য হয়েছিল তার পুরাতন জীবন ত্যাগ করতে, প্রজ্বলিত অগ্নিকাণ্ডে মাতৃভূমির ঝলসে যাওয়া দেখতে এবং নতুন শহর রোম খুঁজে পাবার আগে তাকে নিম্নতলে অবতরণ করতে হয়েছিল। নায়কের পুরাণ এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত যে ঐতিহাসিক চরিত্রদের জীবনকথা যেমন, বুদ্ধ, মুহাম্মদ (সা:), বা যীশু খ্রিস্ট, যেভাবেই বলা হোক না কেন এই আদি ছকের সাথে মিলে যাবেই আর এই কাহিনী প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল সুদূরে প্যালিওলিথিক যুগে।

আবার, মানুষ যখন তাদের গোত্রের বীরদের এসব গল্প অন্যদের বলে, শ্রোতার মনোরঞ্জনই কেবল তারা আশা করে না। পুরাণ আমাদের বলে দেয় পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের কোনো না কোনো একটা পর্যায়ে নায়কের ভূমিকা নিতে হবেই। জরায়ুর সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে প্রতিটা শিশুকেই জোর করে ঠেলে দেয়া হয়, লাসাউক্সের জটপাকানো সুড়ঙ্গপথের সাথে তার কি গভীর সখ্য, তাকে বাধ্য করা হয় মাতৃজঠরের নিরাপদ নিভৃত আশ্রয় ত্যাগ করতে এবং অপরিচিত পৃথিবীর ভীতিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রতিটা মা যে সন্তান জন্ম দেয় এবং নিজের সন্তানের মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়, সেটাও বীরোচিত।[২৩] সবকিছু ত্যাগ করার জন্য তৈরি না থাকলে কেউ বীর হতে পারে না; অন্ধকারের গর্ভে অবক্রান্তি ব্যতীত আলোর উচ্চতায় উঠা সম্ভব না, মৃত্যুর স্পর্শ ব্যতীত নতুন প্রাণের আবাহন অসম্ভব। আমাদের জীবনে সবসময়েই আমরা অপরিচিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হই এবং বীরের পুরাণ বলে দেয় আমাদের আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত।

আমাদের অবশ্যই যাত্রা পথে শেষকৃত্যের মুখোমুখি হতেই হবে, যা মৃত্যুর মোহরখচিত।

পরবর্তীকালের পৌরাণিক সাহিত্যে প্যালিওলিথিক যুগের কিছু বীর স্থান পেয়েছে। গ্রীক দেবতা হেরাক্লিস, যেমন নিশ্চিতরূপেই শিকারী পর্বের টিকে থাকা স্মারক।[২৪] গুহামানবের মতো তার পরনে পশুর চামড়া এবং হাতে লাঠি। হেরাক্লিস একজন শামান, পশুপাখির ব্যাপারে, তার জ্ঞান সুবিদিত; তিনি পাতালে যান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমরত্বের সন্ধানে এবং অলিম্পাস পাহাড়ে দেবতাদের রাজ্যে পৌঁছান। আবার গ্রীক দেবী আর্টেমিসকে বলা হয় 'পশুর কর্ত্রী' একজন শিকারী এবং প্রকৃতিকে বশে রাখতে সাহায্যকারী, তিনিও প্যালিওলিথিক পর্বের একজন হতে পারেন।[২৬]

শিকার একান্তভাবে পুরুষদের কাজ এবং তারপরেও প্যালিওলিথিক পর্বের অন্যতম শক্তিশালী শিকারী একজন নারী। গর্ভবতী মহিলাকে বর্ণনা করে খোদিত অতিপ্রাচীন ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তরমূর্তি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ আর আফ্রিকা জুড়ে যা পাওয়া গেছে, সবই এই পর্বের। আর্টেমিসকে গ্রীক দেবীরূপে কেবল আত্মস্থ করা হয়েছে, ভীতিকর দেবী যে পশুদের কর্ত্রীই কেবল না সেই সাথে প্রাণের উৎসও বটে। প্রতিপালনকারী মমতাময়ী মা না বরং নিষ্করুণ, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং স্বার্থপর। শিকারের পূর্বে আচরিত কৃত্য পালনে ভুল হলে, রক্তপাত আর বলি আদায়ের কারণে কুখ্যাত। এই পরাক্রমশালী দেবী প্যালিওলিথিক পর্ব ভালো করেই উতরে এসেছেন। তুরস্কের কাটাল হুইউক শহরে, সপ্তম কি অষ্টম সহস্রাব্দের, জন্মদানের প্রক্রিয়ায় রত দেবীদের চিত্র খোদাই করা বিশাল বিশাল পাথরের চাই প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেয়েছেন। তাকে বেষ্টন করে থাকে কখনও পশুর দল, মহিষের শিং বা শূকরের করোটি– সফল শিকারের স্মারক বা কখনও পুরুষের প্রতিকৃতি।

প্রবলভাবে পুরুষ শাসিত সমাজে একজন দেবী কিভাবে এতটা পরাক্রমশালী হয়ে উঠেন? হয়তো নারীর প্রতি অবচেতন বিরক্তিই এর কারণ। কাটাল হুইউকের দেবী অনন্তকাল ধরে জন্ম দিয়ে যান কিন্তু তার সঙ্গী ষাঁড়কে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে হবে। নারী এবং শিশুদের বাঁচাতে শিকারীরা নিজের প্রাণ বিপন্ন করে। শিকারের কারণে উদ্ভূত দুশ্চিন্তা আর অপরাধবোধ সাথে পাবলীয় কৌমার্য থেকে উৎপন্ন হতাশা একজন শক্তিশালী নারীর চিত্র প্রক্ষেপ করতে পারে, যে, নিরন্তর রক্তপাত দাবী করে।[২৭] শিকারীদের কাছে সেই মহিলাটি নতুন প্রাণের উৎস– তাদের কারণে– খরচযোগ্য পুরুষরা না– গোত্রের অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়। নারী এভাবেই জীবনের সম্ভ্রম উদ্রেককারী প্রতীকে পরিণত হয়– একটা জীবন যা পুরুষ আর পশুর বিরামহীন বলি দাবী করে।

আমাদের প্যালিওলিথিক অতীতের এসব খণ্ডিত অংশ দেখায় যে, পুরাণতত্ত্ব সর্বরোগ নিরাময়কারী, কোনো উপায় না। জীবন আর মৃত্যুর নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে এটা মানুষকে সাহায্য করে। মানুষের একটা বিয়োগান্তক অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। স্বর্গের উচ্চতায় পৌঁছাবার জন্য তারা ব্যগ্র যদিও বুঝতে পারে যে নিজেদের নশ্বরতার মুখোমুখি হলেই কেবল সেটা সম্ভব। নিরাপদ পৃথিবী ত্যাগ করে, পাতালে অবতরণ করতে হবে এবং নিজের পুরাতন সত্তার মৃত্যু ঘটাতে হবে। পুরাণতত্ত্ব আর এর সাথে আচরিত কৃত্যানুষ্ঠান প্যালিওলিথিক পর্বের মানুষকে জীবনের একটা স্তর থেকে অন্য স্তরে নিতে সাহায্য করেছে এমনভাবে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন সেটাকে সম্পূর্ণ অজানা সত্তায় চূড়ান্ত এবং শেষ অভিমন্ত্রণ হিসাবে দেখা যায়। এই সব প্রাচীন অন্তর্জ্ঞান কখনও লুপ্ত হয়নি যখনই মানব ইতিহাসের পরবর্তী মহান বিবর্তনের পর্যায় শুরু হয়েছে সে তাদের পথ দেখিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. নিওলিথিক পর্ব : কৃষাণের পুরাণ কথা
(অষ্টম সহস্রাব্দ থেকে চতুর্থ সহস্রাব্দ)

আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকাজ রপ্ত করে। শিকার এখন আর খাদ্যের প্রধান উৎস না কারণ তারা আবিষ্কার করেছে পৃথিবী নিজেই খাদ্যের আপাত অফুরন্ত উৎস। কৃষিভিত্তিক নিওলিথিক বিবর্তনের চেয়েও মানবজাতির জন্য কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অগ্রবর্তী এসব কৃষকদের সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয়, আনন্দ আর আতঙ্ক আমরা অনুভব করি, নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার সময়ে তাঁরা যে পুরাণের নির্মাণ করেছিল, পরবর্তীকালের সংস্কৃতির পৌরাণিক আখ্যানে তা খণ্ডিতভাবে রক্ষিত আছে। লোগোসের ফসল হলো কৃষিকাজ কিন্তু আমাদের আজকের প্রযুক্তিগত বিবর্তনের মতো, একে সম্পূর্ণ লোকায়ত উদ্যোগ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। এর দায় বর্তায় একটা মহান আধ্যাত্মিক জাগরণের উপরে যা মানুষকে তাদের পৃথিবী এবং নিজেদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা দেয়।

ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধের সাথে কৃষিকাজের এই নতুন জ্ঞান।[২৮] প্যালিওলিথিক পর্বের লোকেরা শিকারকে পবিত্র কাজের মর্যাদা দিত এবং এখন কৃষিকাজও একটা পবিত্র সংস্কারে পরিণত হয়। জমি চাষ করার সময়ে বা শস্য কাটবার সময়ে কৃষকদের রীতিমতো আচার অনুষ্ঠান পালন করে পবিত্র থাকতে হতো। ফসলের বীজকে তারা মাটির গভীরে প্রবেশ করতে দেখে এবং অনুধাবন করে যে অন্ধকারে খোলস ছেড়ে বীজ জীবনের ভিন্নমাত্রার চমকপ্রদ রূপ সামনে নিয়ে আসে, রোপয়িতা তখন অন্তরালে কর্মরত গোপন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। শস্য আমাদের কাছে একটা বার্তা নিয়ে আসে, দিব্যশক্তির প্রকাশ ঘটায় এবং কৃষকরা জমি চাষ করে যখন গোষ্ঠীর লোকদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে, তারা অনুভব করে একটা পবিত্র পরিবেশে তারা প্রবেশ করেছে এবং এক অলৌকিক প্রাচুর্যের ভাগীদার হয়েছে।[২৯] সব প্রাণীকেই পৃথিবী ধারণ করার ক্ষমতা রাখে– গাছপালা, মানুষ এবং জীবজন্তু– অনেকটা জীবন্ত মাতৃজঠরের মমতায়।

কৃত্যানুষ্ঠানগুলো পরিকল্পিত হয়েছিল এই ক্ষমতা যাতে নিঃশেষ না হয়ে নিজেকে পুনরায় ঋতুমতী করতে পারে। প্রথম শস্যদানা 'পরিত্যাগ' করা হতো উৎসর্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবে, বাগানের প্রথম ফলটা ছোঁয়া হতো না, এসবই করা হতো পবিত্র শক্তিকে পুনরায় খাদ্য উৎপাদনক্ষম রাখতে। এমন নজিরও পাওয়া গেছে যে মধ্য আমেরিকায়, আফ্রিকার কিছু অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলসমূহে এবং দ্রাবিড় ভারতবর্ষে নরবলি পর্যন্ত উৎসর্গ করা হতো। এসব কৃত্যানুষ্ঠানের মূলে ছিল দুটো মূলনীতি। প্রথম, কোনো কিছু উৎসর্গ না করে কিছু পাবার আশা তুমি করতে পার না; কিছু পেতে হলে তাই তোমাকেও কিছু দিতে হবে। দ্বিতীয়টা বাস্তবতার পবিত্র অন্তর্জ্ঞান। প্রাকৃতিক জগতের ঊর্ধ্বে কোনো বিমূর্ত বাস্তবতা হিসাবে পবিত্রতাকে অনুভব করা হতো না। পৃথিবী এবং তার অনুসঙ্গে কেবল তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা নিজেরাই পবিত্রতার স্মারকখচিত। মানুষ, দেবতা, পশুপাখি এবং গাছপালা একই প্রকৃতির মাঝে বিরাজমান এবং সেজন্য একে অন্যকে পূর্ণ প্রদীপ্ত পুষ্ট করতে পারবে।

মানুষের যৌনতার কথাই ধরা যাক, পৃথিবীকে ফলবতী উর্বরা করে যে দিব্য শক্তি তার সাথেই মূলত একে এক করে দেখা হতো। নিওলিথিক পুরাণ শুরুর দিকে, নবান্নকে দেখা হতো এই দিব্য বন্ধনের ফসল হিসাবে, একটা পবিত্র বিয়ে : মাটি হলো নারী; বীজগুলো পবিত্র বীর্য; এবং বৃষ্টি হলো স্বর্গ আর মর্ত্যের মহামিলন। ফসল বোনার সময়ে নারী পুরুষের শারীরিক মিলনে নিয়োজিত হওয়া ছিল একটা সাধারণ আচার অনুষ্ঠান। তাদের নিজস্ব মিলন নিজেই একটা পবিত্র কর্ম, মাটির উৎপাদনী শক্তিকে যা জাগিয়ে তুলবে, কৃষকের কোদাল বা লাঙল ঠিক যেন একটা সমুত্তেজিত পুরুষাঙ্গের প্রতীক যা পৃথিবীর উদর উন্মুক্ত করবে এবং বীজ দিয়ে, একে বড় করে তুলবে। বাইবেলে আমরা দেখতে পাই খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন ইসরাইলীদের পালনীয় রীতি রেওয়াজ হিসাবে বন্য যৌনোৎসব পালন করতে, যা হোসা আর এজিকিয়েলের মতো নবীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। জেরুজালেমের মন্দিরে পর্যন্ত আশেরাহ্ এর সম্মানে পূজার আয়োজন করা হতো, কানানের উর্বরতার দেবী এবং আম্রপালিদের বাসস্থান।[৩০]

নিওলিথিক বিবর্তনের শুরুর দিকে, অবশ্য পৃথিবীকে সব সময়ে রমণী হিসাবে গণ্য করা হতো না।[৩১] চীন এবং জাপানে ভূমির সত্তাকে ক্লীব হিসাবে গণ্য করা হতো এবং পরবর্তীকালে সম্ভবত সংসারে নারীর মমতাময়ী রূপ দেখে পৃথিবীকে নারীর রূপ আরোপিত করে মমতাময়ী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য অংশে পৃথিবীর উপরে কোনো মানবিক চরিত্র আরোপ করা হয়নি কিন্তু পবিত্র হিসাবে তাকে সম্মান করা হতো। নারীর শিশু জন্ম দেবার মতো সে তার উদর থেকে সবকিছুর জন্ম দিত। ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায় প্রথম সৃষ্ট কিছু পুরাণ কল্পনা করেছে যে মানুষ গাছলতার মতোই প্রথমবার পৃথিবীর বুক চিরে আলোয় এসেছিল : গাছের মতোই, তাদের জীবন পাতালগর্ভে শুরু হয়েছিল যতক্ষণ না নতুন মানুষ পৃথিবী পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় বা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত এবং মানব মা তাদের সংগ্রহ করে।[৩২] মানুষ এক সময় দিব্যের সাথে সাযুজ্য বিধান করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের উচ্চতায় তোলার কথা কল্পনা করেছে সেই তারাই এখন পৃথিবীর পবিত্রতার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য নানা আচার অনুষ্ঠান নির্মাণ করে। লাসাউক্সের প্যালিওলিথিক গুহার মতো নিওলিথিক গোলক ধাঁধা আবিস্কৃত হয়েছে কিন্তু পার্থক্য হলো পাতালে পবিত্র জন্তুর সাথে সাক্ষাৎকারের বদলে উপাসনাকারীরা কল্পনা করত তারা ধরিত্রী মায়ের গর্ভে প্রবেশ করছে এবং সমস্ত প্রাণের উৎসে এক ধরনের মরমী প্রত্যাবর্তন ঘটাচ্ছে।[৩৩]

এই সমস্ত সৃষ্টি পুরাণ মানুষকে শিক্ষা দেয় পাথর, নদী আর গাছগাছালীর মতো তারাও একইভাবে পৃথিবীর অঙ্গীভূত। পৃথিবীর প্রাকৃতিক উত্থানপতনকে সম্মান জানানো তাই তাদের উচিত। অন্যেরা কোনো একটা স্থানের সাথে একটা গভীর একাত্মতা প্রকাশ করে, পরিবার বা পিতৃত্বের চাইতে গভীর কোনো বন্ধন। প্রাচীন গ্রীসে এই ধরনের পুরাণ বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ইরেকথোনিয়াস এথেন্সের পঞ্চম পৌরাণিক সম্রাট, আর্কোপলিসের পবিত্র ভূমি থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, একটা বিশেষ মন্দিরে বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই পবিত্র ঘটনাটা উদ্‌যাপিত হয়েছে।

নিওলিথিক বিবর্তন সৃষ্টিকারী শক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে যা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে । প্রথমে এটা ছিল পার্থক্যরহিত একটা পবিত্র শক্তি, যা পৃথিবীকে দিব্যের প্রকাশে বাধ্য করেছিল। কিন্তু পৌরাণিক কল্পনা সবসময়ে ধীরে ধীরে, নিরেট এবং পূর্ণ তথ্যজ্ঞাপক হয়ে উঠে; শুরুতে যা ছিল নিরাকার তার সংজ্ঞা নির্ণীত হয় এবং সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আকাশের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে ঠিক যেভাবে আকাশ দেবতার মানবিককরণ সম্পন্ন হয়েছে মাতৃপ্রতিম প্রতিপালনকারী পৃথিবী ঠিক একইভাবে ধরিত্রী মাতার রূপ গ্রহণ করেছে। সিরিয়াতে তাকে বলা হয় আশেরাহ, এল এর সঙ্গী, ঊর্ধ্ব দেবতা বা আনাট্, এল এর কন্যা; পারস্যের সুমের অঞ্চলে একে বলা হয় ইনানন্না; মিশরে, আইসিস, গ্রীসে সে পরিণত হয় হেরা, ডিমিতির এবং অ্যাফ্রোডাইটে। শিকারী সমাজের মহান মাতার সাথে ধরিত্রী মাতা অঙ্গীভূত হয়ে তার ভয়ংকর গুণাবলী অনেকাংশে অক্ষুণ্ন রাখেন। আনাট, যেমন এক নির্মম যোদ্ধা, প্রায়ই রক্তের সমুদ্রের মাঝে হেঁটে যাচ্ছে এমনভাবে তাকে চিত্রিত করা হয়; ডিমিতিরকে বলা হয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ এবং চণ্ড এমনকি অ্যাফ্রোডাইটে ভালবাসার দেবী তিনিও ভয়ংকর প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

আবার অন্যদিকে পুরাণ পলায়নী প্রবৃত্তিসম্পন্ন না। নতুন নিওলিথিক পুরাণ মৃত্যুর বাস্তবতা স্বীকার করার জন্য মানুষকে বাধ্য করে। এগুলো কেবল পল্লীজীবনের সহজ সরল দৃশ্যপট ব্যাখ্যাকারী না। এবং ধরিত্রী মাতাও নমনীয় উপশমকারী দেবী নন, কারণ কৃষিকাজকে শান্তিপূর্ণ ধ্যানমগ্ন পেশা হিসাবে বিবেচনা করা হতো না। এটা ছিল একটা চলমান যুদ্ধ প্রক্রিয়া, মরিয়া সংগ্রাম, খরা, বন্ধ্যাত্ব, দুর্ভিক্ষ আর প্রকৃতির প্রলয়ংকরী শক্তির বিরুদ্ধে, যা কিনা আবার দিব্য শক্তি হিসাবেও প্রতিভাত।[৩৪] ফসল রোপণের কল্পিত যৌনতার মানে অবশ্য এই না যে মানুষও কৃষিকাজের অভিজ্ঞতাকে প্রণয়াভিসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবে দেখতো। মানুষের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া মা এবং নবজাতকের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। একইভাবে, কঠিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেই কেবল ভূমি কর্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়। জেনেসিসে, আদিম স্বর্গীয় দশার বিলুপ্তিকে কৃষিকাজে নিয়োজিত হওয়া হিসাবে বিবেচিত হয়। ইডেনে, প্রথম মানবসন্তানেরা অনায়াসে ঈশ্বরের বাগানের যত্ন নিত। পতনের পরে, নারী তার সন্তানকে দুঃখের মাঝে নিয়ে আসে, এবং পুরুষকে কপালের ঘাম ঝরিয়ে মাটির কাছ থেকে আহার্য আহরণ করতে হয়।[৩৫]

প্রাচীন পুরাণে, কৃষিকাজকে সহিংসতা হিসাবে বিবেচনা করা হতো এবং মৃত্যু আর ধ্বংসের দিব্য শক্তির বিরুদ্ধে একটা ক্রমাগত যুদ্ধ প্রক্রিয়া। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বীজকে যেতে হবে– এবং ফসল উৎপাদনের নিমিত্তে নিজেকে আত্মত্যাগ করতে হবে এবং এই মৃত্যু কষ্টকর এবং অভিজ্ঞতাবহুল। চাষাবাদের অনুষঙ্গসমূহকে আয়ুধের মতো দেখতে লাগতো, শস্যদানাকে অবশ্যই গুঁড়ো করে ফেলতে হবে, এবং আঙ্গুর থেকে ওয়াইন উৎপাদনের আগে তাকে বিকৃত মণ্ডে পরিণত করতে হবে। ধরিত্রী দেবী সম্পর্কিত পুরাণে আমরা এসব দেখতে পাই, তার সব সহচরদের নির্মমভাবে ছিঁড়ে টুকরা করা হয়, অঙ্গহানি ঘটে এবং নিষ্ঠুরভাবে কেটে ফেলে হত্যা করা হয়, নতুন জীবন নতুন শস্যের সাথে পুনরায় মাথা তোলার আগে। মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রামের কথাই ধ্বনিত হয় এসব পুরাণে। প্যালিওলিথিক যুগ থেকে শুরু হওয়া বীরোচিত পুরাণে, প্রায়শই এক বীর পুরুষ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে তার লোকদের জন্য সাহায্য নিয়ে আসতো। নিওলিথিক বিবর্তনের পরে, পুরুষদের প্রায়শই অসহায় এবং জড় হিসাবে দেখা যায়। এখানে আমরা এক নারী ঈশ্বরীকে খাদ্যের সন্ধানে পথিবীব্যাপী ঘুরে বেড়াতে দেখি, মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করে সে মানবজাতির জন্য পুষ্টি বয়ে আনে। ধরিত্রী মাতা নারীর বীরত্বের প্রতীকে পরিণত হয় পুরাণে যা শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাই বলে।

ঝড়ের দেবী, বাআলের বোন এবং স্ত্রী, আনাটের পুরাণে একটা বিষয় পরিষ্কার যা কেবল কৃষিকাজের কষ্টের কথাই রূপায়িত করে না সাথে সম্প্রীতি এবং পরিপূর্ণতা অর্জনের শ্রমসাধ্যতার কথাও বলে। বাআল, রোদে বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া পৃথিবীর বুকে যে বৃষ্টি ঝরায়, সে নিজে বিশৃঙ্খলা আর বিচ্ছিন্নতার দানবদের সাথে সৃষ্টিশীল সংঘাতে সতত লিপ্ত থাকে। একদিন, মৃত্যু, খরা আর বন্ধ্যাত্বের দেবতা তাকে আক্রমণ করে, যে পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন প্রান্তরে পরিণত করার হুমকি ক্রমাগত দিতে থাকে। মটের হুমকির মুখে, বাআল একবার ভয় দমন করে কোনো ধরনের প্রতিরোধ না গড়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। মট তাকে উপাদেয় ভেড়ার মাংসের মতো চিবিয়ে খায় এবং তাকে জোর করে পাতালে মৃতদের রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। বাআল আর পৃথিবীতে বর্ষা আনতে পারে না, গাছগাছালি পানির অভাবে শুকিয়ে মারা যেতে শুরু করে, চারপাশ থেকে বিলাপের সুর ভেসে আসে। এল বাআলের বাবা– এক আদর্শ আকাশ দেবতা– অসহায়। তিনি যখন বাআলের মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন, উঁচু সিংহাসন থেকে নেমে এসে ছেঁড়া কাপড় পরিধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন, এবং শোকের সনাতন কৃত্য অনুযায়ী নিজের গালে ক্ষত সৃষ্টি করেন, কিন্তু তারপরেও ছেলেকে বাঁচাতে পারেন না। আনাট্ একমাত্র কার্যকর দেবী। দুঃখ আর ক্ষোভে ভারাক্রান্ত, সে সমগ্র পৃথিবী, ক্ষ্যাপার মতো নিজের *অস্টার ইগো*, তার বাকী অর্ধাংশের খোঁজে দাপিয়ে বেড়ায়। যে সিরিয়ান পুঁথিতে এই পুরাণটা সংরক্ষিত আছে সেখানে বলা হয়েছে যে সে বাআলের জন্য ব্যাকুল হয়েছে 'গাভী যেমন বাছুরের জন্য ভেড়ী যেমন তার শাবকের জন্য' হয়ে থাকে।[৩৬] সন্তানেরা যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন ধরিত্রী দেবী জন্তুর মতোই হিংস্র এবং নিয়ন্ত্রণের অতীত হয়ে পড়েন। আনাট বাআলের দেহাবশেষ খুঁজে পেলে তার সম্মানে সে এক যজ্ঞের আয়োজন করে এবং এলের উদ্দেশে একটা আবেগময় অভিযোগ উচ্চারণ করে, কিন্তু মটকে খোঁজা থেকে সে বিরত থাকে না। সে যখন তাঁকে খুঁজে পায়, পূজোয় ব্যবহৃত কাস্তে দিয়ে চিরে তাকে সে দু'টুকরো করে ফেলে, ঝাঁঝরি দিয়ে শস্যদানা চালার মতো করে তাকে চালে, আগুনে পোড়ায়, জাঁতায় ফেলে পেষে এবং তার মাংস সারা প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয় ঠিক যেমন একজন কৃষক তার শস্যের সাথে ব্যবহার করে।

আমাদের তথ্য ভাণ্ডার এখনও সমৃদ্ধ হয়নি তাই আমরা এখনও জানি না আনাট কিভাবে বাআলকে পুনরায় জীবিত করেছিল। বাআল আর মট দু'জনেই ঐশ্বরিক, সেজন্যই কাউকে পুরোপুরি নাশ করা সম্ভব নয়। দু'জনের ভিতরে সংঘর্ষ চলতেই থাকবে, এবং মৃত্যুর থাবা বাঁচিয়ে প্রতি বছর শস্য ঘরে তোলা হবে। পুরাণের একটা ভাষ্যে আছে, আনাট বাআলকে এতটাই পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করে যে মট পরবর্তীকালে তাকে আক্রমণ করলে সে পূর্বাপেক্ষা তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে তার জবাব দিতে সক্ষম হয়। বৃষ্টি পৃথিবীতে ফিরে আসে, উপত্যকায় মধুর নহর বইতে আরম্ভ করে এবং স্বর্গের মূল্যবান তেল বৃষ্টির আকারে বর্ষিত করে। বাআল আর আনাটের শারীরিক মিলন দিয়ে গল্পটা শেষ হয়, পরিপূর্ণতা এবং সমাপ্তির একটা ছবি, প্রতি বছর নবান্নের সময় ধর্মীয় প্রার্থনার ভঙ্গিতে বার বার যা অভিনীত হয়।

মিশরে আমরা একই ধরনের পুরাণ দেখতে পাই তবে আনাটের চেয়ে আইসিস অনেক দুর্বল। ওসিরিস, মিশরের প্রথম সম্রাট, তার লোকদের চাষাবাদের জ্ঞান দান করেন। তার ভাই সেথ ছিল, সিংহাসনপ্রত্যাশী, সে তাকে হত্যা করে এবং আইসিস তার বোন এবং স্ত্রী সারা পৃথিবী তার দেহের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সে যখন মৃতদেহ খুঁজে পায়, সে তাকে সামান্য সময়ের জন্যেই পুনর্জীবিত করতে পারে যখন সে তার এক পুত্র হোরাসকে তার বংশ রক্ষার জন্য রাজি করায় তার পরেই সে আবার মারা যায়। তারপরে ওসিরিসের শরীর টুকরো টুকরো করে কাটা হয় এবং প্রতিটা খণ্ড বীজের ন্যায়, মিশরের বিভিন্ন অংশে রোপণ করা হয়। সে মৃতদের পৃথিবী দোয়াতের শাসনকর্তা হয় এবং প্রতি বছর নবান্ন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তারই, তার মৃত্যু এবং অঙ্গহানি, শস্য কাটা এবং ঝারাইয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় আচারের ভঙ্গিতে অভিনীত হয়। মৃতের দেবতা প্রায়শই ফসলেরও দেবতা, জীবন আর মৃত্যু অচ্ছেদ্যভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িত সেটাই দেখায়। একটাকে ছাড়া আরেকটাকে পাওয়া সম্ভব না। দেবতা মারা গিয়ে আবার প্রাণ ফিরে পাওয়া একটা বিশ্বজনীন প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে অনেকটা ঋতুর আগমন আর বিদায় নেবার মতো। নূতন প্রাণের আবাহন হয়তো হবে কিন্তু এসব পুরাণের মূল বৈশিষ্ট্য এবং শস্যদায়ী দেবতার মৃত্যুর এই প্রথা সবসময়েই বিপর্যয় আর রক্তপাতে মেদুর এবং প্রাণের শক্তির বিজয় কখনও সমাপ্ত হয় না।

পারস্যের দেবী ইনানার পাতাল প্রবেশের ঘটনা যে পুরাণে বিবৃত হয়েছে সেখানে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। দিকশূন্যপুরে আরেকটা অভিমন্ত্রণের যজ্ঞ হিসাবে এটাকে দেখা যেতে পারে, মৃত্যুর অভিজ্ঞতা যা নতুন জীবনের সূচনা করবে। পৃথিবীর গর্ভে ইনানার এই বিপদসঙ্কুল যাত্রার পেছনে তার কোনো শুভ উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদের সূত্র ঘেঁটে, যা অসম্পূর্ণ, আমরা যতদূর বলতে পারি, তার উদ্দেশ্য ছিল তার বোন এরেসকিগাল, নরকের রানী, যে আবার অন্যদিকে প্রাণের সঙ্গী, তার রাজ্য অন্যায়ভাবে দখল করা। এরেসকিগালের লাপিসলাজুলি প্রাসাদে প্রবেশের আগে বোনের শহরের সাতটা দেয়ালের সাতটা দরজা তাকে অতিক্রম করতে হবে। প্রতিবার দ্বাররক্ষী ইনানাকে থামার নির্দেশ দিয়ে পরিচয় জানতে চায় এবং তাকে বাধ্য করে তার পরিধেয় বস্ত্রের একটা অংশ ত্যাগ করতে, এভাবে অবশেষে বোনের সামনে হাজির হলে দেখা যায়, ইনানা তার সব রক্ষাকবচ খুইয়ে ফেলেছে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং পাতালের সাত বিচারক ইনানাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয় এবং তার শবদেহ একটা শূলে গেঁথে প্রদর্শনের জন্য রেখে দেয়া হয়।

ইনানাকে অবশ্য অন্য দেবতারা উদ্ধার করে এবং এক দঙ্গল শয়তানের সাথে পৃথিবীতে তার প্রত্যাবর্তন ভয়ংকর এবং উল্লাসপূর্ণ। সে যখন প্রাসাদে ফিরে আসে, দেখে তার সুদর্শন তরুণ মেষপালক স্বামী দুমুজি, তার সিংহাসনে বসার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। ক্রোধে কুপিত হয়ে, ইনানা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে, দুমুজি পালায়, শয়তানের প্ররোচনা তাকে বাধ্য করে পাতালে গিয়ে ইনানার স্থান নিতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতা হয়, সেখানে দুমুজি আর তার বোন জেসটিনানার মাঝে বছরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, প্রত্যেকেই এরেসকিগালের সাথে পাতালে ছয়মাস পর্যায়ক্রমে কাটাবে। কিন্তু ইনানার অভিযানের ফলে পৃথিবীর চিত্র চিরকালের মতো বদলে যায়, দুমুজি অনুপস্থিত বিধায়, এখন শস্যের নতুন দেবতা ঋতু পরিবর্তন ঘটাতে থাকেন। সে যখন ইনানার কাছে ফিরে আসে, মেষশাবকের জন্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবী প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, এবং শস্যে ফুল ফুটতে শুরু করে, দ্রুত নবান্ন এসে হাজির হয়। সে যখন পাতালে চলে যায় তখন পৃথিবীতে গ্রীষ্মের দাবদাহ লম্বা খরা বয়ে আনে। মৃত্যুর উপরে কেউ চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারে না। যে সুমেরীয় কবিতায় এই পুরাণটা বিধৃত হয়েছে সেটা শেষ হয়েছে একটা আর্তির মধ্য দিয়ে : এরিসকিগাল! তোমার প্রশংসা মহান![৩৭] যেটুকু মনে থাকে তা নারীর মর্মান্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাপ, বিশেষ করে, দুমুজির মা, যখন নিজের সন্তান হারাবার জন্য শোক প্রকাশ করে, 'একটা নিঃসঙ্গ স্থানে একাকী; যেখানে সে এক সময় জীবিত ছিল, এখন ভূমিশয্যা নিয়েছে যুবা ষাড়ের মতো'।[৩৮]

আমাদের এই ধরিত্রী দেবী ত্রাণকর্তা নন, বরং মৃত্যু আর কষ্টের কারণ। তার যাত্রা একটা, পরিবর্তনের আচার যা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজনীয়। ইনানা পাতালে যায় তার বোনের সাথে দেখা করতে, তার নিজের সত্তার একটা চাপা পড়া অশঙ্কিত রূপ। এরেসকিগাল চূড়ান্ত বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। মূলত এসময় থেকেই, অনেক পুরাণে, ধরিত্রী দেবীর সাথে দেখা হওয়াটাকেই নায়কের চূড়ান্ত অভিযান হিসাবে দেখানো হয়, চরম উদ্ভাসন। জীবন ও মৃত্যুর দয়িতা এরেসকিগালও একজন ধরিত্রী দেবী, যিনি ক্রমাগত জন্ম দিয়ে চলেছেন। তার নিকটে পৌঁছাতে চাইলে, এবং সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হলে, ইনানাকে তার কাপড় সরিয়ে রেখে যা তার ঘাতোপযোগিতাকে রক্ষা করে, আত্মপ্রচার জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজের পুরাতন সত্তাকে হত্যা করে, যা আপাতদৃষ্টিতে তার বিপরীত আর বৈরী তাকে আত্তীকৃত করে, এবং অসহ্যকে গ্রহণ করে : যথা, মৃত্যু অনুকার এবং বঞ্চনা ব্যতীত কোনো জীবন থাকতে পারে না।[৩৯]

ইনানার সাথে সম্পৃক্ত আচার অনুষ্ঠান তার কাহিনীর শোকাবহতার উপরে আধারিত এবং বসন্ত কালে দুমুজির সাথে তার একত্রিত হওয়াটা কখনও উদ্‌যাপন করা হয় না। কারণ এটা খুব শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত যা অস্তিত্বের মূলনীতি হিসাবে অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়, ধর্মীয় প্রথা বেশ ব্যাপক বিস্তৃত। ব্যাবিলনে ইনানাকে ইশতার নামে অভিহিত করা হয়, সিরিয়াতে আশতারতে (আশেরাহ্); নিকট প্রাচ্যে দুমুজি, তামুজ নামে পরিচিত এবং এই অঞ্চলের রমণীরা তার মৃত্যুতে শোক পালন করে থাকে।[৪০] গ্রীসে তাকে ডাকা হয় এডনিস নামে, কারণ সেমিটিক দুনিয়ার মেয়েরা তাদের 'লর্ড' (এডন) এর জন্য শোক পালন করে। এডনিসের কাহিনী সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এর মূল আখ্যানে, সুমেরীয় পুরাণের সাথে এর মৌলিক বিন্যাসে মিল রয়েছে, সেখানে দেখানো হয় যে দেবী মৃত্যুর কাছে তার তরুণ প্রেমিককে হস্তান্তর করছে।[৪১] শিকারীদের মহান দেবীর ন্যায়, নিওলিথিক ধরিত্রী দেবী আমাদের দেখায় যে, যদিও পুরুষকে অনেক শক্তিশালী বলে মনে হয় তবে মেয়েরাই অধিক শক্তিশালী এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাদেরই হাতে।

ডিমিতির আর তার কন্যা পার্সিফোনের পুরাণে এটা আপাতভাবে ফুটে উঠেছে, যা নিশ্চিতভাবেই নিওলিথিক পর্বের।[৪২] শস্যমাতা ডিমিতির দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর উর্বরতা শক্তি আর শস্য রক্ষা করা। পাতালের শাসক হেডেস পার্সিফোনকে অপহরণ করলে ডিমিতির মাউন্ট আলিম্পাসের আবাস পরিত্যাগ করে বেদনাবিধুর চিত্তে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায়। কুপিত হৃদয়ে সে নবান্ন আটকে দিয়ে মানুষকে অনাহারে রাখার হুমকি দেয় যদি না তাকে তার কন্যা কোরে (মেয়ে) ফেরত দেয়া না হয়। শঙ্কিত হয়ে দেবরাজ জিউস, দিব্য বার্তাবাহক হার্মেসকে পাঠান কোরেকে উদ্ধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দিকশূন্যপুরে অবস্থানকালে সে কিছু ডালিমের বীচি খেয়ে ফেলে এবং সে কারণে বছরের চারমাস হেডেসের সাথে কাটাতে বাধ্য হয় এখন যে তার পতিদেব। মায়ের সাথে পুনরায় তার মিলন ঘটলে ডিমিতির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং পৃথিবী আবারও শস্যশ্যামল হয়ে উঠে।

এটা প্রকৃতির কোনো মামুলি রূপক নয়। ডিমিতির কৃত্যানুষ্ঠান শস্য রোপণ বা কাটার সাথে কখনও মিলে না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বীজের ন্যায় পার্সিফোনই হয়তো অবতরণ করে কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একটা বীজ থেকে কয়েক সপ্তাহে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে, সেজন্য চারমাস অপেক্ষা করতে হয় না। ইনানার পুরাণের ন্যায়, এটা আরেকটা দেবীর উধাও হয়ে ফিরে আসবার গল্প। এটা মৃত্যু সম্পর্কীয় পুরাণ। প্রাচীন গ্রীসে, ডিমিতির, শস্য দেবী, আবার মৃত্যুর সহচরী এবং এথেন্সের কাছে অ্যালুসিসে অবস্থিত রহস্যময় প্রার্থনা সভার সভাপতিত্বকারী। এগুলো সব গোপন কৃত্য কিন্তু মনে হয় যে এসব *মিসটাই* (দীক্ষা) কৃত্য মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা মেনে নেয়ার লক্ষ্যে সূচিত যা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এভাবেই মৃত্যু সম্পর্কিত ভীতি কাটানো হয়। এই দীর্ঘ দীক্ষাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মনমানসিকতার উপরে এইসব শক্তিশালী কৃত্যানুষ্ঠান পুরাণের অর্থ অনপনেয়ভাবে মুদ্রিত করে দেয়। মৃত্যুর উপর চূড়ান্ত বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। কোরেকে অনন্তকাল ধরে মর্ত্য আর পাতালে ঘুরে বেড়াতে হবে। কুমারীর প্রতীক মৃত্যু ব্যতীত কোনো জীবন খাদ্য বা শস্যকণা বেঁচে থাকতে পারবে না।

অ্যালুসিনিয়ান রহস্য সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানি, কিন্তু যারা এসব কৃত্যে অংশ নিত তারা বিভ্রান্তবোধ করত যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হতো সত্যিই কি তারা বিশ্বাস করে যে পার্সিফোন আসলেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল, পুরাণে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণটা সত্যি, কারণ যেদিকেই তুমি তাকাবে দেখবে জীবন আর মৃত্যু অচ্ছেদ্য এবং পৃথিবী মারা গিয়ে পুনরায় প্রাণের স্পন্দনে ফিরে আসে। মৃত্যু, ভীতিকর, আতঙ্কময় এবং অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সেটাই শেষ কথা না। একটা গাছ কেটে তার মৃত শাখা ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেখান থেকে একটা চারা গাছ জন্মায়। কৃষিকাজ একটা নতুন, যদিও সীমিত অর্থে, সম্ভাবনার কথা বলে।[৪৩] শস্য জন্ম দেবার জন্য বীজকে মারা যেতে হবে; ডালপালা ছাঁটা গাছের জন্য আক্ষরিক অর্থে মঙ্গলময় এবং নতুন প্রবৃদ্ধিকে স্বাগত জানায়। অ্যালুসিসে দীক্ষানুষ্ঠান দেখায় যে মৃত্যুর সাথে মোকাবেলা আধ্যাত্মিক জাগরণের দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের ক্ষেত্রে সেটা নিড়ানির কাজ করে। এটা অমরত্ব বয়ে আনবে না– সেটা কেবল দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট– কিন্তু এটা আমাদের নির্ভীকভাবে আর পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে সাহায্য করে এবং মৃত্যুর মুখের দিকে এখন অনেক শান্তভাবে আমরা তাকাতে পারি। বাস্তবিক প্রতিদিন আমরা আমাদের অর্জিত সত্তাকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হই। নিওলিথিক সময়েও শেষকৃত্যের পুরাণ এবং আচারাদি মানুষকে তাদের মরণশীলতা মেনে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যেতে সাহায্য করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. সভ্যতার সূচনাপর্ব
(খ্রি : পূ: ৪০০০ থেকে খ্রি: পূ: ৮০০ সাল) :

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ সালের দিকে মানুষ সামনের দিকে আরেকটা বড় পদক্ষেপ নেয়, এসময়ে তারা বিভিন্ন নগরীর পত্তন করতে শুরু করে, প্রথমে পারস্যে এবং মিসরে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ সালে এবং পরবর্তীকালে চীন, ভারত এবং ক্রীটে। এসব প্রাচীন সভ্যতার কিছু কোনো স্মারক ব্যতীত পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে কিন্তু উর্বর চন্দ্রাকৃতি ভূখণ্ড, এখন যেখানে ইরাক অবস্থিত, আমরা পুরাণে নগরায়নের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের একটা প্রাথমিক প্রয়াস দেখতে পাই যা শহুরে জীবন উদ্‌যাপন করে। এ সময়ে মানুষ অনেক বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠে। উন্নত মার্জিত চিত্রকলায় মানুষ এখন তার আকাঙ্ক্ষার স্থায়ী ছাপ আঁকতে সক্ষম এবং অক্ষর আবিষ্কারের মানে দাঁড়ায় নিজেদের পৌরাণিকতত্ত্বের স্থায়ী সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা এখন তারা দিতে পারবে। তারা ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করে : শহরগুলোতে, পরিবর্তনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং কার্যকরণের পরস্পরা সম্পর্কে মানুষ অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠে। নতুন নতুন প্রযুক্তি শহরের অধিবাসীদের প্রকৃতির উপরে অধিকমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ কায়েমে সাহায্য করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে তাদের সাথে ব্যবধান বাড়াতে থাকে। উত্তেজনা, স্বাধীনতা আর গর্বের একটা সময় ছিল সেটা।

কিন্তু এই মাত্রার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ব্যাপক ভয়েরও জন্ম দিয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, ইতিহাস পূর্ণ বিলয়ের একটা প্রক্রিয়া, কারণ প্রতিটি নতুন পরিবর্তনের জন্য পূর্ববর্তী সবকিছুর ধ্বংসের প্রয়োজন।[৪৪] পারস্যের শহরগুলোর ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে এটাই ঘটেছিল, সেখানকার মাটির তৈরি দেয়ালগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ আর মাঝে মাঝেই পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হতো। তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমিতে বিলীন হয়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের উপরে নতুন কাঠামো নির্মিত হয়েছিল এবং ক্ষয় আর নবায়নের এই প্রক্রিয়া শহর পরিকল্পনার নতুন বিদ্যার জন্ম দিয়েছিল।[৪৫] সভ্যতার অভিজ্ঞতা ছিল জাঁকজমকপূর্ণ কিন্তু ভঙ্গুর, একটা শহর নাটকীয়ভাবে কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে ততোধিক দ্রুততায় বিলুপ্তির গর্ভে তলিয়ে যেত। যখন একটা নগর-রাষ্ট্র সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপরে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাব বিস্তার করে। তার ইতিহাস যুদ্ধ, গণহত্যা, বিদ্রোহ আর নির্বাসনের ইতিহাস। ধ্বংসযজ্ঞের মানে হলো তিল তিল করে বহু শ্রমে গড়ে তোলা সংস্কৃতিকে পুনর্নির্মাণ আর প্রতিষ্ঠা করতে হবে বার বার। জীবন আবার পুরাতন বর্বরতায় ফিরে যাবে এই ভয় সবসময়ে কাজ করতো। ভয় আর আশার জট পাকানো পরিস্থিতিতে, নিয়ম আর অনিয়মের মাঝে অনন্ত সংগ্রামকে, নতুন শহুরে পুরাণ মধ্যস্থতার চেষ্টা করে।

নতুন সভ্যতাকে কেউ কেউ যখন বিপর্যয়ের চোখে দেখে তখন অবাক হবার কিছু থাকে না। বাইবেলের লেখকরা একে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুতির একটা স্মারক হিসাবে দেখেন, ইডেন থেকে নির্বাসনের পরে থেকে যা তাদের অনুসরণ করছে। শহুরে জীবনের বৈশিষ্ট্যই যেন হিংসা, মারামারি আর স্বার্থসিদ্ধির বোঝাপরা। কেইন ছিল প্রথম শহরটার নির্মাতা আবার প্রথম হত্যাকারীও বটে।[৪৬] তারই বংশধরেরা সভ্যতার আবিষ্কারক : জুবাল ছিল 'বীনা এবং বংশীবাদক সবার পূর্বপুরুষ,' এবং টুবালকেইন ছিল 'সব ধরনের ব্রোঞ্জ আর লোহার হাতিয়ারের নির্মাতা'।[৪৭] ব্যাবিলনের বিখ্যাত মন্দিরের তোরণ বা ziggurat প্রাচীন ইসরালাইটসদের উপরে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। পৌত্তলিক প্রগলভ অহংকার, যার মূল প্রেষণা কেবলমাত্র আত্ম-সংবর্ধনার আকাঙ্ক্ষা এটা তারই প্রতিনিধিত্বকারী বলে তাদের কাছে মনে হয়েছিল। তারা একে টাওয়ার অভ ব্যাভেল বা ব্যাবেল বলে অভিহিত করতো কারণ এর নির্মাতাদের শাস্তি দেবার জন্য ঈশ্বর 'পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠীর ভাষায় একটা বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাদের ছড়িয়ে দেন'।[৪৮]

পারস্যের লোকেরা কিন্তু শহরকে এমন একটা স্থান হিসাবে বিবেচনা করতে থাকে যেখান থেকে তারা দিব্যের মোকাবেলা করতে পারবে। এটা ছিল– প্রায়–হারিয়ে যাওয়া স্বর্গের পুনর্নির্মাণ। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পাহাড়কে মন্দির তোরণ বা ziggurat প্রতিস্থাপন করে, যা প্রাচীন মানুষদের দেবতাদের রাজত্বে বেয়ে উঠতে সাহায্য করতো। দেবতারা শহরে বাস করেন, মানুষের পাশাপাশি দিব্য জগতে তাদের প্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত মন্দিরে তাদের অধিষ্ঠান। প্রাচীন পৃথিবীর সব শহরই ছিল পবিত্র শহর। তাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন শিকার আর চাষাবাদকে পবিত্র এবং সাংস্কারিক হিসাবে বিবেচনা করতো, গোড়ার দিকের এসব শহরবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকেও তেমনি পবিত্র হিসাবে বিবেচনা করতো। পারস্যে, দেবতারা মানুষকে শিখিয়েছিল কিভাবে উঁচু তোরণযুক্ত মন্দির নির্মাণ করতে হয়, এবং জ্ঞানের দেবতা এনকি ছিল চামার, কামার, নাপিত, কুমার, রাজমিস্ত্রী, সেচ, কবিরাজ, সঙ্গীতশিল্পী এবং লেখকদের পৃষ্ঠপোষক।[৪৯] তারা জানত যে তারা একটা চমকপ্রদ কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছে যা মানুষের জীবন চিরতরে বদলে দেবে; তাদের নগরগুলো ছিল সর্বব্যাপী কারণ তারা পূর্বেকার জ্ঞাত সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দেবতাদের দিব্য সৃষ্টিশীলতায় তারা অংশ নিয়েছিল, যারা বিশৃঙ্খলার বিভ্রান্তিতে সামান্য পরিমাণে হলেও শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পারস্যের লোকদের অহংকারী হিসাবে কল্পনা করাটা ইসরালাইটসদের ভুল হয়েছিল। তারা জানত যে মানবজীবন, দেবতাদের জগতের তুলনায়– এমনকি তাদের অতিকায় নগরগুলোতেও– ত্রুটিপূর্ণ এবং স্বল্পস্থায়ী যা এখনও তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপট জুড়ে রয়েছে। তাদের নগরগুলো হারিয়ে যাওয়া স্বর্গ ডিলমানের জেলো প্রতিচ্ছবি, যেখানে এখন কেবল দেবতারা এবং কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ বাস করে। তারা খুব ভালো করেই জানত যে, মানব জীবনের মতো, সভ্যতাও নশ্বর এবং অস্থায়ী। ঘনবিন্যস্ত, বিচ্ছিন্ন এবং পাহাড় দ্বারা বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে সুরক্ষিত এবং নীল নদের নিয়মিত বন্যার কারণে উর্বরা মিশরে মানুষের এইসব পার্থিব অর্জনের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পারস্যে, যেখানে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিসের বন্যা ছিল অতর্কিত এবং প্রায়শই বিধ্বংসী, যেখানে মৌসুমী বৃষ্টি মাটিকে চোরাকাদায় পরিণত করতো বা লু হাওয়া তাকে করতো ধুলোয় মলিন, যেখানে বহিরাগত শত্রুর হামলার হুমকি লাগাতার বিব্রত করত মানুষকে, সেখানে জীবন ছিল অনেক বেশি অরক্ষিত। প্রকৃতির বিধ্বংসী আর খেয়ালী শক্তির হাত থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে বীরোচিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বন্যা পুরাণে এসব ভয়ের কথা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কোনো প্রাকৃতিক বাধা না থাকার কারণে পারস্যের নদীসমূহের সহসা গতিমুখ পরিবর্তন করা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল আর সে কারণে ঘন ঘন বন্যা হতো এবং প্রায়শই তার মাত্রা হতো প্রলয়ংকর। মিশরের মতো, বন্যাকে এখানে আশীর্বাদ হিসাবে দেখা হতো না, বরং তা রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিনাশের রূপকে পরিণত হয়।

যখনই ইতিহাসের নতুন পর্বে মানুষ প্রবেশ করেছে, মানবতা এবং ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে তাদের ধারণা পাল্টে গেছে। এসব প্রাচীন সভ্যতাসমূহে, নারী ও পুরুষ আধুনিক আমাদের মতো, আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠে যে নিজের নিয়তির কারিগর তারা নিজেরাই। একইসাথে, দেবতাদের সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষদের লালিত বিশ্বাস তাদের মাঝে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। মানুষের কর্ম মূল উপলক্ষ্য হবার কারণে, দেবতাদের অনেক দূরবর্তী বলে মনে হয়; নাগালের সামান্য বাইরে স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা হিসাবে তারা তাদের যোগ্যতা হারায়। নতুন শহুরে পুরাণ বন্যাকে মানব-দিব্য সম্পর্কের মাঝে একটা সংকট হিসাবে বর্ণনা করে। Atrahasis-এ, পারস্যের সবচেয়ে দীর্ঘ বন্যা কাব্য, দেখা যায় দেবতারাও মানুষের মতো নগর পরিকল্পক। গ্রামাঞ্চলকে বসবাসযোগ্য করার উদ্দেশ্যে সেচ খাল খননের সীমাহীন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতারা ধর্মঘট করলে, ধরিত্রী দেবী মানুষ সৃষ্টি করেন তাদের দিয়ে এসব ভৃত্যের কাজ করাবেন বলে। কিন্তু অচিরেই তাদের সংখ্যা মাত্রা ছাড়ায় এবং হট্টগোলের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঝড়ের দেবতা এনলিল এই চিৎকার চেঁচামেচিতে জেগে উঠতে বাধ্য হলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা নিষ্ঠুর পদ্ধতির সাহায্য নেন, তিনি পৃথিবীকে প্লাবিত করেন। কিন্তু এনকি শুরুপ্পাক শহরের 'চূড়ান্ত জ্ঞানী মানুষ' আথরাহ্‌সিসকে[৫০] বাঁচাতে চান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনের ভিতরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায়, এনকি আথরাহ্সিসকে একটা নৌকা বানাতে বলেন, পানিরোধী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তিনিই তাকে বলে দেন এবং এই ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের কারণে আথরাহসিস, নূহ (আ:) এর ন্যায় তার পরিবারকে এবং সমস্ত গাছগাছালির বীজ রক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু পানি নেমে যাবার পরে, ধ্বংসযজ্ঞ দেখে দেবতারাই ভীত হয়ে উঠেন। পারস্য পুরাণে, পৃথিবী থেকে দেবতাদের প্রস্থানের সূচনা এই বন্যার পর থেকেই শুরু হয়। এনকি আথরাহসিস আর তার স্ত্রীকে ডিলমানে নিয়ে যান। মানুষের ভিতরে কেবল তারাই অমরত্বের বরাভয় লাভ করেন এবং দেবতাদের সাথে পুরাতন সখ্য বজায় রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু গল্পটা একই সাথে মানবজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে যে দিব্য প্রযুক্তি উজ্জীবিত হয়েছিল সেটারও জয়গান গায়। আমাদের আধুনিক সমাজের মতো, পারস্যে এই সময় থেকেই সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পুরান এবং প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

পারস্যবাসীরা কিন্তু পুরোপুরি আমাদের ন্যায় ছিল না। দেবতারা হয়তো বিদায় নিয়েছিল কিন্তু মানুষ তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে সর্বব্যাপী উপাদান সম্পর্কে অধিকমাত্রায় সচেতন রয়ে যায়। একেকজনে দেবতার পার্থিব জায়গীর হিসাবে একেকটা শহরকে অভিহিত করা হয় এবং প্রতিটি নাগরিক– শাসক থেকে শুরু করে নগণ্য শ্রমিক সবাই– পৃষ্ঠপোষক দেবতা– এনলিল, ইনানা বা এনকির– অধীনতা মেনে নেয়।[৫১] মানুষ তখনও বর্ষব্যাপী দর্শন আঁকড়ে ছিল, যা পৃথিবীর সবকিছুই দিব্য বাস্তবতার প্রতিরূপ হিসাবে দেখতো। নগর রাষ্ট্রগুলো বয়স্কদের একটা সংঘ শাসন করত, পারস্যবাসীরা তাই বিশ্বাস করতো যে শীর্ষস্থানীয় দেবতাদের ঐশ্বরিক একটা সংঘও দেবতাদের শাসন করে। তারা আরও মনে করতো যে, ক্ষুদ্র কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী থেকে যেমন তাদের শহুরে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক উত্থানপতনের সাথে যা সম্পৃক্ত, দেবতাদের মাঝেও একই ধরনের বিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল।

ব্যাবিলোনিয়ান মহাকাব্যে যে সৃষ্টি পুরাণ টিকে আছে শুরুর শব্দ দিয়েই যা পরিচিত *Enuma Elish* . আমাদের এই ভাষ্য খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম অর্ধের কিন্তু অনেক পুরাতন বিষয়বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত।[৫২] দেবতাদের সৃষ্টি রহস্য দিয়ে কাব্যটার সূচনা যেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে প্রথমে দেবতাদের সৃষ্টি হয়েছিল। শূন্য থেকে সৃষ্টির (ex nihilo) কোনো কথা সেখানে নেই, কেবল একটা বিবর্তনের প্রক্রিয়া। সেখানে পবিত্র আদি বস্তু থেকে, যা এক প্রকার পিচ্ছিল, অনির্ধারিত পদার্থ, যেখানে কোনো কিছুরই কোনো পরিচয় নেই, প্রথম পর্যায়ের দেবতাদের সৃষ্টি হয়। লবণ আর তিক্ত পানি এক সাথে মথিত হয়, আকাশ, পৃথিবী বা সমুদ্রের কোনো আলাদা অস্তিত্ব ছিল না; এবং দেবতারাও তখন ছিলেন 'নামহীন, পরিচয়হীন এবং আকৃতিহীন'।[৫৩] এই নোংরা থেকে সৃষ্ট এই দেবতারা উপাদান থেকে ছিল অচ্ছেদ্য। আপসু ছিল মিষ্টি পানির নদী, তিয়ামাত ছিল লবণাক্ত সমুদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর মুম্মু ছিল ধোঁয়াটে মেঘ। তাদের নামগুলোকে আমরা ভাষান্তরিত করতে পারি যথাক্রমে 'অতল গহ্বর,' 'শূন্যতা' এবং 'তলাবিহীন খাদ' হিসাবে।

এসব আদি দেবতারা তখনও ছিল আকৃতিহীন এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তাদের ভিতর থেকে অন্যান্য দেবতারা জোড়া জোড়ায় আবির্ভূত হন, প্রতিটি জোড়া পূর্ববর্তী জোড়া অপেক্ষা স্পষ্টভাবে নির্দেশিত। এসব দিব্য উপাদান পরস্পর থেকে পৃথক হলে একটা সুবিন্যস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব লাভ করে। প্রথমে সৃষ্টি হলো পলিমাটি (কাদা ও পানি সহযোগে), যথাক্রমে লাহমু আর লাহামু দ্বারা। তারপরে আনশের এবং কিশর (আকাশ এবং সমুদ্রের দিগন্ত) এবং সবশেষে আকাশ দেবতা, অনু এবং ধরিত্রী আ। কিন্তু দেবতাদের সৃষ্টির এই পুরাণ সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক বিবর্তনের অধিবিদ্যামূলক অনুমান নির্ভর না; গভীর চিন্তার একটা ছাপ আমরা পারস্যের মাঝে অনুভব করি পলিমাটি জমে সৃষ্টি হওয়া পাললিক অঞ্চল। অন্যদিকে মানব জগতের একটা দিক হলো ঐশ্বরিকতা। ভূ-প্রকৃতি থেকে দেবতারা অচ্ছেদ্য এবং পারস্যের অন্যতম প্রাচীন শহর এরিদুতে অগভীর লবণাক্ত উপহ্রদ যা বসতিকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল এবং যা প্রার্থনা কেন্দ্র ঘিরে রেখেছে, তাকে আপসু বলা হয়। পুরাণে প্রকৃতি থেকে ক্রমিক বিচ্যুতির কথা বলা হয়েছে যা নতুন শহরের বাসিন্দারা নিজেদের ভিতরে অনুভব করেন।

নতুন দেবতারা অনেক বেশি সক্রিয় এবং তাদের পিতামাতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম : আপসু ভূগর্ভের অতলে দেবে যায় এবং আ আর অনু তার জীর্ণ খোলসের উপর নিজেদের প্রাসাদ তৈরি করে। প্রার্থনা আর মন্ত্রণাকক্ষ সম্বলিত। শহুরে দালানসমূহ সব সময়ে পারস্যের সৃষ্টিতত্ত্বের গৌরবময় মুহূর্ত চিহ্নিত করতো। কিন্তু তিয়ামাত এখনও পরাস্ত হয়নি এবং আপসুর বদলা নিতে সে ভয়ংকর দানবদের একটা বাহিনী তৈরি করে। আর যোগ্য সন্তান মারডুক একমাত্র দেবতা যে, তাকে যুদ্ধে হারাতে সক্ষম। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মারডুক, তিয়ামাতের বিশাল শবের উপর দাঁড়িয়ে এক বিশাল খোলসি মাছের মতো তাকে দু'টুকরো করে স্বর্গ আর মর্ত্যের সৃষ্টি করে যেখানে এখন থেকে কেবল মানব সন্তানেরা বাস করবে। সে আইন প্রণয়ন করে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নতুন শৃঙ্খলা সুসংবদ্ধ করার জন্য একটা দিব্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। শেষে, অনেকটা পরবর্তীকালীন অনুধ্যানের ন্যায়, মারডুক তার হাতে পরাস্ত এক দেবতার রক্তের সাথে একমুঠো ধুলো মিশিয়ে প্রথম মানুষ তৈরি করেন, তিনি দেখাতে চান দেবতারা কেবল তাদের অতিপ্রাকৃতিক এবং প্রাকৃতিক জগতে একলা, আলাদা নেই, বরং মানব সম্প্রদায় এবং প্রাকৃতিক জগৎ সবই একই দিব্য বস্তু থেকে তৈরি হয়েছে।

মানুষের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে পুরাণ যা দেবতাদের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পারস্যের নগর-রাষ্ট্রের বিবর্তন এতে প্রতিফলিত হয়, প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজ থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (সেটাকে এখন অনুন্নত এবং স্থবির আখ্যা দেয়া হয়েছে) এবং সামরিক শক্তির দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিজয় সমাপ্ত হবার পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারডুক ব্যাবিলনের পত্তন করে। শহরের কেন্দ্রে ইসাগলিয়ার সুউচ্চ মিনারযুক্ত মন্দির, দিব্য জগতে মারডুকের প্রার্থনালয়ের প্রতিরূপ। 'অনন্ত স্বর্গের স্মারক' হিসাবে শহরের সব ভবনের মধ্যে উঁচু মন্দির পরবর্তীকালে দেবতাদের পার্থিব বাসগৃহের মর্যাদা পায়। শহরের নাম 'বাব-ইলানি' (দেবতাদের তোরণ) রাখা হয় কারণ এখানেই ঐশ্বরিকতা মানুষের পৃথিবীতে প্রবেশ করে। ইসাগিলার, পবিত্র বিধান উদ্‌যাপন করতে দেবতারা একত্রিত হন যা থেকে ব্রহ্মাণ্ড তার কাঠামো লাভ করেছে, গোপন পৃথিবী হয়েছে স্পষ্ট এবং ব্রহ্মাণ্ডে দেবতাদের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৫৪]

নতুন শহরটা axis mundiকে এবার প্রতিস্থাপন করতে পারে। যা স্বর্ণযুগে স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝে যোগসূত্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল।

বাইবেলও সৃষ্টি পুরাণ সংরক্ষণ করেছে যাতে আমরা দেখি তিয়ামাতের ন্যায় ইয়াহ্‌ওয়েহ্ সমুদ্রের একটা দানবকে হত্যা করে পৃথিবীকে অস্তিত্ব প্রদান করেন।[৫৫]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এধরনের আখ্যান মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের ভিতরে বেশ জনপ্রিয়। এটা তাদের বিশ্বাসকেই সমর্থন করে যে সভ্যতা একটা চলমান সংগ্রাম, পশ্চাদপসরণ করে আকৃতিহীন বর্বরতায় পতন থেকে রক্ষা পেতে অভিভূত করার মতো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। নববর্ষের উৎসবের চতুর্থ দিনে *এনুমা এলিশ* সুর করে গাওয়া হয়। যে কোনো পৌরাণিক আখ্যানের ন্যায়, সময় নিরপেক্ষ পবিত্র ক্ষণে রহস্যময় এবং অশিষ্ট ঘটনা যা সংঘটিত হয়েছিল, তারই একটা বর্ণনা। সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার মতো না যা শেষ হয়ে হেজেমজে গেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি একটা চলমান প্রক্রিয়া; বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ঐশ্বরিক যুদ্ধ আজও ঘটমান এবং বিশৃঙ্খলা এবং বিপর্যয় রুখতে মানুষের দিব্য শক্তির বরাভয় প্রয়োজন।

প্রাচীন পৃথিবীতে, অপ্রেক্ষিত বস্তু বা ঘটনা থেকে তার প্রতীক অচ্ছেদ্য হয়ে উঠে। কারণ সাদৃশ্যতা এক ধরনের পরিচয়ের জন্ম দেয়, অদৃশ্য বাস্তবতাকে বর্তমান করে তুলে। নববর্ষের উৎসবের প্রতীকী কৃত্যানুষ্ঠান একটা নাটক, যা, যে কোনো ভালো নাটকের ন্যায়, স্থানকালের বেড়াজাল ছিন্ন করে, দর্শক এবং কুশীলবদের তাদের পার্থিব চিন্তাবিষ্টতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পবিত্রতার ভান করা পুরো ব্যাপারটাই একটা খেলা। প্রার্থনাকারীরা অনুভব করে যে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রেক্ষাপট সৃষ্টিকারী যে অনন্ত ঐশ্বরিক জগৎ তারা সেখানে ব্যস্ত হয়ে উঠছে। শেষ হয়ে আসা বছরের জীর্ণতা কাটাতে ছাগল বলি দেয়া হয়; তিয়ামাতের বিরুদ্ধে মারডুকের সংঘর্ষ উপস্থাপিত করতে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার আয়োজন করা হয়; খেলাচ্ছলে রাজাকে লাঞ্ছিত করে উৎসবের মধ্যে থেকে একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে বিশৃঙ্খলার শক্তিগুলোকে আবার সৃষ্টি করা হয়। আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অবলুপ্তি আধ্যাত্মিক বৈকল্যকে স্মরণ করে শামানরা তাদের দীক্ষার সময়ে, যা অনুভব করত, এবং অতিক্রমণের যজ্ঞের প্রত্যাবৃত্তি সতর্কতার সাথে বিন্যস্ত করা হতো। প্রাচীন আধ্যাত্মিকতায়, যে কোনো নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আদ্যকালীন বিশৃঙ্খলায় প্রতীকী প্রত্যাবর্তন ছিল অপরিহার্য।[৫৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যেমন জানি, সৃষ্টির গল্প কখনও মানুষকে জীবনের উৎস সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করে না। প্রাচীন কালে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির গল্প সাধারণত নির্দিষ্ট বিধিমতে আবৃত্তি করা হতো এবং চরম মুহূর্তে : নতুন অভিযানের শুরুতে তারা অজানার দিকে তাকিয়ে আছে– নববর্ষে, বিয়েতে বা রাজাভিষেকের সময়ে, যখন মানুষ দিব্য শক্তির আশীর্বাদ কামনা করে। কিছু জানানো এর উদ্দেশ্য না, এর উদ্দেশ্য মূলত নিরাময় সংক্রান্ত। মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পুরাণের আবৃত্তি তখনই শ্রবণ করে যখন তারা কোনো আসন্ন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়, যখন তারা কোনো সংঘাতের সমাপ্তি চায় বা কোনো অসুস্থকে আরোগ্য লাভ করাতে চায়। মূল ধারণাটা হলো অনন্ত শক্তির বরাভয় লাভ যা মানুষের অস্তিত্বকে ধারণ করে আছে। পুরাণ এবং এর আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটাই স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় যে ভালো হবার আগে পরিস্থিতি প্রায়ই অনেক সময় খারাপের দিকে যায়, এবং বেঁচে থাকা আর সৃষ্টিশীলতা উভয়েরই জন্য প্রয়োজন নিবেদিত শ্রম নিষ্ঠা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অন্যান্য গল্পে সত্যিকারের সৃষ্টিশীলতা আত্মোৎসর্গ দাবী করে এমনটা বলা হয়েছে। ভারতীয় বৈদিক পুরাণে, আত্মাহুতির ফলেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। **পুরুষ**, এক মহাজাগতিক দৈত্য, নিজেকে দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করলে, তারা তাকে বলি দিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করেন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সামাজিক শ্রেণী যা মানব সমাজ গঠন করেছে তার ধড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং সেজন্য এটা পবিত্র এবং প্রশ্নাতীত। চীনে, আরেকটা দৈত্য পানগু, তাকে নিয়ে একটা জনপ্রিয় পুরাণ রয়েছে, সে ৩৬০০০ বছর পরিশ্রম করেছে চলনসই বিশ্ব সৃষ্টি করতে এবং তারপরে এই পরিশ্রমের কারণে ক্লান্ত হয়ে সে মারা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পুরাণে একই ছক আমরা দেখতে পাই। তিয়ামাত, ইট, এবং লেভিয়াথান কেউই খল না তারা কেবল তাদের মহাজাগতিক ভূমিকা পালন করেছে। মরতে তাদের হবে আর মৃত্যুর পর অঙ্গহানি সহ্য করার পরেই কেবল বিশৃঙ্খলা থেকে সুশৃঙ্খল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব ঘটতে পারে। টিকে থাকতে, সভ্য সমাজ অন্যের মৃত্যু আর ধ্বংসের উপরে নির্ভর করে এবং দেবতা এবং মানুষ কেউই সত্যিকারের সৃষ্টিশীল হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে।

এখন পর্যন্ত পৌরাণিক তত্ত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপেই আদ্যকালীন বৈশিষ্ট্যকেন্দ্রিক এবং দেবতাদের সংগ্রাম বা আদ্যকালীন সময়ের পূর্বপুরুষদের আদি রূপের উপর কেন্দ্রীভূত। কিন্তু এখন থেকে শহুরে পুরাণ ঐতিহাসিক জগতের উপরে অভিঘাত সৃষ্টি করবে। কারণ মানুষ এখন পূর্বেকার চাইতে অনেক বেশি নিজের উদ্ভাবন কুশলতার উপরে নির্ভরশীল, মানুষ ক্রমশ নিজেকে স্বাধীন সত্তা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ড এখন প্রধান হয়ে উঠেছে এবং সেইসাথে পাল্লা দিয়ে দেবতারাও দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। পুরাতন গল্প কবিরা নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করছে। এই বিষয়টা আমরা ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য যা *গিলগামেশের মহাকাব্য* নামে পরিচিত সেখানে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিলগামেশ সম্ভবত কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র, খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালে সম্ভবত তিনি জীবিত ছিলেন : দক্ষিণ পারস্যে উর্কের পঞ্চম রাজা হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং পরবর্তীকালে তিনি লোককথার নায়কে পরিণত হন। তার ভৃত্য এনকিডুর সাথে তার অভিযান প্রাচীন কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু। সেখানে আমরা বীরোচিত এবং শামানিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি যেমন দানবের সাথে যুদ্ধ, পাতাল ভ্রমণ, এবং দেবীদের সাথে মিলন। পরবর্তীকালে এসব কাহিনীতে গূঢ় মানে আরোপিত হয়েছে এবং অনন্ত জীবনের অভিযানে পরিণত হয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০ সালে লিখিত, এই মহাকাব্যের সর্বশেষ নমুনায়, আমরা দেখি মানুষের সংস্কৃতির স্বরূপ এবং সীমা নিয়ে পুরাণ অনুসন্ধান করতে চাইছে।

মহাকাব্যের শুরুতে, আমরা দেখি মানুষ গিলগামেশ পথ হারিয়েছে। তার হৃদয় বিক্ষুব্ধ এবং নিজের লোককেই সে ভয় দেখাতে শুরু করলে, তারা দেবতার কাছে গিয়ে প্রতিকার চায়। কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় হলো, দেবতারা এখন আর সরাসরি মানুষের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজি না এবং তারা একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গিলগামেশকে বশে আনতে তারা এনকিডুকে সৃষ্টি করেন, বন্য আদিম এক মানুষ গ্রামাঞ্চলে যে মনের ফুর্তিতে ঘুরে বেড়ায়। তার দেহ রুক্ষ চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত, অপরিপাটি চুল, উলঙ্গ, ঘাস খায় আর পুকুরের পানি পান করে, এনকিডু হলো 'মানুষ-শুরুতে-যা-ছিল,'[৫৭] মানুষের চাইতে পশুর সাথে থাকতেই সে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এনকিডুকে বশ মানাতে, গিলগামেশ বেশ্যা সামহাতকে পাঠায় তাকে সভ্য আদব কায়দা শিখাতে। সামহাতের সাথে ছয় রাত কাটাবার পরে, এনকিডু বুঝতে পারে প্রকৃতি এবং পশু জগতের সাথে তার যে বন্ধন ছিল সেটা ভেঙে গেছে। সে ক্রমশ সভ্য হয় কিন্তু এতে লাভ আর ক্ষতি দুটোই হয়। এনকিডুর পশুসত্তা 'লোপ' পেয়েছে বটে কিন্তু একইসাথে সে হয়ে উঠেছে 'দেবতার ন্যায়' এবং 'দুর্জ্ঞেয়'।[৫৮] উর্কের পরিশীলিত জীবনযাত্রা উপভোগ করার মতো জ্ঞান এবং শিষ্টাচার তার ভিতরে এসেছে কিন্তু সেটা মানবিকতার স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে এতদূর বিস্তৃত যে একে ঐশ্বরিক বলে মনে হয়।

গিলগামেশ আর এনকিডু পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হয়, এবং তাদের অভিযান শুরু করে। এক সাথে ঘুরে বেড়াবার সময়ে তাদের দেখা হয় ইশতারের সাথে। প্রাচীন পুরাণে ধরিত্রী দেবীর সাথে বিয়ে প্রায়শই সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জনের বিষয়টা বোঝাত এবং সেটা হতো বীরের অভিযানের চরম পরিণতি, কিন্তু গিলগামেশ ইশতারকে ফিরিয়ে দেয়। প্রচলিত পুরাণের এটা একটা কঠোর সমালোচনা, যা শহুরে নারী পুরুষের সাথে আর তাল রাখতে পারে না। গিলগামেশ সভ্যতাকে ঐশ্বরিক প্রচেষ্টা বলে মনে করতেন না। এশতার সংস্কৃতি ধ্বংসকারী : সে অনেকটা পানির আবরণের মতো যা এর বহনকারীকে শুষে নেয়, একটা জুতো যা পরিধানকারীকেই খোচায় এবং একটা দরজা যা বায়ু প্রবাহ রোধ করতে পারে না।[৫৯] তার কোনো সম্পর্কই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; সে তার প্রতিটা প্রেমিকের সর্বনাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে।[৬০] দায়িত্বজ্ঞানহীন দেবতাদের সাথে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক যোগাযোগ ছাড়াই মরণশীলেরা ভালো থাকবে। গিলগামেশ, সভ্য মানুষ, দিব্যর কাছ থেকে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এবার সময় হয়েছে দেবতা আর মানুষের পৃথক পথ অবলম্বন করার।

ইশতার প্রতিশোধ নেয়, এবং এনকিডু অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। গিলগামেশ বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাকেও মরতে হবে এই উপলব্ধির ফলে যখন সে ভারাক্রান্ত, তখন তার মনে পড়ে বন্যার কবল থেকে যে বেঁচে গেছে– এই মহাকাব্যে উথনাপিসতিম বলে অভিহিত করা হয়েছে– তাঁকে অনন্ত জীবন দান করা হয়েছে, সে তখন তার সাথে দেখা করার জন্য ডিলমান রওয়ানা হয়। কিন্তু মানুষ প্রাচীন আধ্যাত্মিকতায় ফিরতে পারবে না এবং দেবতাদের রাজ্যের খোঁজে এই অভিযান সাংস্কৃতিক প্রত্যাবৃত্তির পরিচায়ক; তৃণভূমির মাঝে গিলগামেশ ঘুরে বেড়ায়, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, চুল বড় বড়, লজ্জাস্থান সিংহের চামড়া দিয়ে ঢাকা। একজন শামানের ন্যায়, জনবসতিহীন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে সে সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করে, মনশ্চক্ষে পাতাল অবলোকন করে এবং 'দেবতাদের গোপন জ্ঞান' খুঁজে বেড়ায়।[৬১] শেষ পর্যন্ত সে যখন ডিলমানে পৌঁছায়, উথনাপিসতিম তাকে বোঝায় যে দেবতারা তাদের প্রিয় মানুষের জন্য আর প্রাকৃতিক নিয়ম স্থগিত করবে না। মানুষের আকাঙ্ক্ষার পথপ্রদর্শক হিসাবে পুরাতন পুরাণ আর কোনো কাজে আসবে না। ডিলমান ভ্রমণ পুরাতন পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।[৬২] আথরাসিসে, বন্যার গল্প দেবতাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এখানে উথনাপিসতিম তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে, নৌকা তৈরি করে পানিতে ভাসাতে গিয়ে সে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং বন্যার দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি তার নিজের মানবিক প্রতিক্রিয়া। পুরাতন পুরাণগুলো পবিত্র পৃথিবীকেন্দ্রিক ছিল ক্ষণস্থায়ী ঘটনা বা চরিত্রের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ ছিল না তাদের, আর এখানে ঐতিহাসিক গিলগামেশ পৌরাণিক উথনাপিসতিমের সাথে দেখা করে। ইতিহাস পুরাণকে আঘাত করতে শুরু করেছে, একই সাথে দেবতারাও মানুষের পৃথিবী ছেড়ে প্রস্থান আরম্ভ করেছেন।[৬৩]

দেবতাদের কাছ থেকে প্রাধিকার বলে সংবাদ পাবার বদলে, গিলগমেশ মানুষের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে কষ্টদায়ক শিক্ষা লাভ করে। সে সভ্যতার কাছেই ফিরে আসে : গোসল করে, সিংহের চামড়া বর্জন করে, চুল পরিপাটি করে বিন্যস্ত করে পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করে। এরপরে উর্কের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে সে মনোনিবেশ করে এবং সভ্য শিল্পকলার চর্চা শুরু করে। ব্যক্তি গিলগামেশ মারা যাবে, কিন্তু এসব সৌধচূড়ায় সে অমরত্ব লাভ করবে, বিশেষ করে লেখনীর আবিষ্কারের কারণে, যা তার অর্জনকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করবে।[৬৪] উথনাপিসতিম দেবতাদের সাথে কথা বলে যেখানে জ্ঞানী হয়েছিল, সেখানে গিলগমেশ ঐশ্বরিক সহায়তা ছাড়াই নিজের অভিজ্ঞতা বলতে শিখে নেয়। তার কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে কিন্তু তার বদলে সে 'পরিপূর্ণ' জ্ঞান লাভ করেছে, 'ক্লান্ত কিন্তু আত্মসমর্পিত চিত্তে' ফিরে এসেছে।[৬৫] প্রাচীন পৌরাণিক অন্তর্জ্ঞান থেকে সে দূরে সরে গিয়েছে কিন্তু ইতিহাসের নিজস্ব সান্ত্বনা রয়েছে।

গ্রীসেও প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শের একই ধরনের পূর্ণ মূল্যায়ন হয়েছে। এডোনিসের পুরাণে, যেমন, ডুমুনিস আর ইশতারের গল্প নতুন করে লেখা হয়েছে এবং একে একটা রাজনৈতিক পুরাণের রূপ দেয়া হয়েছে।[৬৬] এডোনিস নাগরিকত্ব লাভের যোগ্য না। এক হতাশ শিকারী, সে নিশ্চয়ই দীক্ষাদানের অনুষ্ঠান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল যা সদ্যযুবা গ্রীকদের নাগরিকে পরিণত করে, বা প্রায়শই যা শিকারের অভিজ্ঞতার উপর আধারিত হতো। দুই দেবীর বন্ধনে আবদ্ধ, সে কখনও মেয়েদের আকর্ষণ কাটাতে পারেনি। প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্র Polis-এ পরিবারের মাধ্যমে গ্রীক নাগরিকেরা একতাবদ্ধ হতো কিন্তু এডোনিস ব্যভিচারের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান, এমন একটা কাজ যা পারিবারিক আদর্শকে নস্যাৎ করে এবং নিজের আপন পরিবার খুঁজে পেতে সে ব্যর্থ হয়। তার দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনযাপন স্বেচ্ছাচারেরই নামান্তর, এমন এক ধরনের প্রশাসন যা আইনের উর্ধ্বে রাজাকে স্থান দেয় এবং এথেন্সবাসীরা যা বর্জন করেছে। এডোনিসের উৎসবের, বৈশিষ্ট্যই হলো মেয়েদের মাত্রা ছাড়া বিলাপ, পুরুষরা যাকে বিতৃষ্ণার সাথে দেখে। সংক্ষেপে, সে ছিল রাজনৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী, এবং এথেন্সবাসীদের হয়তো সাহায্যই করেছিল সংযমের বিপরীত সব কিছুকে মানবিক গুণাবলী দ্বারা প্রকাশ করে নিজেদের সীমা নির্ধারণে, Polis এর পুরুষদের মূল্যবোধ।

শহুরে জীবন পুরাণকে বদলে দিয়েছে। দেবতারা দূরবর্তী হতে শুরু করেছেন। দিব্য জগতে নারী ও পুরুষকে পৌঁছে দিতে পুরাতন আচার অনুষ্ঠান আর গল্পজ্ঞানের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হচ্ছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের এক সময় মানসিক পুষ্টি জুগিয়েছে। শহরগুলো আরো সংগঠিত হলে, পাহারাদারীর দক্ষতা বাড়লে এবং চোর ও ডাকাতদের শাস্তি দেয়ার হার বেড়ে গেলে, দেবতারা যেন ক্রমশ মানবতার দুর্দশা সম্পর্কে উদাসীন বেখেয়াল হয়ে উঠেন। একটা আধ্যাত্মিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সভ্য পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে, পুরাতন আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পায় এবং এর স্থান নিতে নতুন কিছু সামনে এগিয়ে আসে না। শেষ পর্যন্ত এই অস্থিরতা আরেকটা মহান রূপান্তরের জন্ম দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. যুগান্তকারী পর্ব
(খ্রিঃ পূঃ ৮০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ২০০)

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক নাগাদ, অস্থিরতা আরও ছড়িয়ে পড়ে, এবং চারটি আলাদা অঞ্চলে দৈবজ্ঞ আর ঋষিদের একটা চিত্তাকর্ষক বিন্যাস নতুন সমাধান খুঁজতে শুরু করে। জার্মান দার্শনিক জ্যাসপার এই সময়কে 'Axial Age' বলে অভিহিত করেছেন কারণ মানবতার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই সময় নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে; এই সময়ে অর্জিত অন্তর্জ্ঞান আজও নারী পুরুষের আত্মিক পুষ্টি সাধন করছে।[৬৭] আমরা আজ ধর্ম বলতে যা বুঝি এসব ছিল তারই সূচনাপর্ব। মানুষ নিজেদের প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে এবং নিজেদের পরিস্থিতি আর সীমাবদ্ধতা নজিরবিহীন স্পষ্টতায় বুঝতে পারে। নতুন ধর্মীয় আর দার্শনিক পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে : চীনে কুনফুসিয়ানিজম আর তাওবাদ; ভারতবর্ষে বৌদ্ধ আর হিন্দু ধর্ম; মধ্যপ্রাচ্যে একেশ্বরবাদ এবং ইউরোপে গ্রীক যুক্তিবাদ। সপ্তম, অষ্টম আর ষষ্ঠ শতকের মহান হিব্রু দৈবজ্ঞদের মতো মানুষ এসব যুগান্তকারী প্রথার সাথে যুক্ত ছিলেন; উপনিষদের ঋষিমণ্ডলী আর বুদ্ধদেব (খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩) ভারতবর্ষে; চীনের কনফুসিয়াস এবং ডাও ডে জিঙের;[৬৮] এবং গ্রীসের সক্রেটিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৬৯-৩৯৯), প্লাটো (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) এবং এরিস্টটলের (খ্রিঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) মতো পঞ্চম শতকের ট্র্যাজেডি লেখকবর্গের কথাও উল্লেখযোগ্য।

যুগান্তকারী এই সময়ের অনেক কিছুই এখনও রহস্যাবৃত। আমরা জানি না ভারতীয়, চৈনিক, গ্রীক আর ইহুদিরাই কেন এর সাথে সংযুক্ত হয়েছিল এবং কেনইবা এর সাথে তুলনীয় কোনো কিছুর পারস্য বা মিশরে উদ্ভব ঘটেনি। একটা বিষয় অবশ্যই সত্যি যে এসব অ্যাক্সিয়াল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ভিতরে পতিত হয়েছিল। যুদ্ধ, নির্বাসন, গণহত্যা আর শহরের বিনাশ ঘটেছিল এখানে। একটা নতুন বাজার অর্থনীতিও ক্রমশ গড়ে উঠছিলো; রাজা আর পুরোহিতদের কাছ থেকে ক্ষমতা ক্রমশ বণিকদের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছিল আর এর ফলে পুরাতন সামাজিক কাঠামোতে একটা টানাপোড়েন দেখা দিয়েছিল। প্রত্যন্ত মরুভূমি বা পাহাড়ের নিরালা গুহায় এসব নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়নি, বরং পুঁজিবাদ আর স্বচ্ছলতার বাতাবরণে তাদের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব অভ্যুত্থান যুগান্তকারী অ্যাক্সিয়াল বিপ্লবকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না, যা মানুষ পরস্পরের সাথে, নিজের সাথে এবং তার চারপাশের পৃথিবীর সাথে যেভাবে জড়িত, তাতে একটা অনপনেয় ছাপ ফেলেছে।

সব যুগান্তকারী অ্যাক্সিয়াল আন্দোলনের অপরিহার্য উপাদানগুলো একই ধরনের। তারা মানুষের দুর্ভোগ যাকে মানুষের পরিস্থিতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হতো সে সম্পর্কে ভীষণমাত্রায় সচেতন এবং সবাই আরো বেশি মাত্রায় আধ্যাত্মিক ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যা কেবল বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান এবং পূজা অর্চনার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ব্যক্তিগত চেতনা আর নৈতিকতা সম্পর্কে তাদের একটা নতুন ভাবনা ছিল। তাছাড়া প্রথাগত কৃত্যানুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করাটাই যথেষ্ট না; ভক্ত অনুরাগী ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের সাথে বসবাসরত অন্য মানুষদের সাথে ভক্তিসহকারে আচরণ করতে হবে। তাদের সময়ের হিংস্র আচরণ সব ঋষিরাই বর্জন করেছিলেন এবং ন্যায়বিচার আর করুণাময় নীতিকথা প্রচার করেছেন। তারা তাদের শিষ্যদের শিখিয়েছেন সত্যের জন্য নিজের ভিতরে অনুসন্ধান করতে এবং পুরোহিত আর অন্যান্য ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের শিক্ষার উপর নির্ভর না করার জন্য। বিশ্বাস করে কোনো কিছু গ্রহণ করলে চলবে না, সবকিছুকে প্রশ্ন করতে হবে এবং পুরাতন মূল্যবোধ যাকে মেনে নেয়া হয়েছে তাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করতে হবে। আর একটা ক্ষেত্র যার পূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োজন সেটা হলো অবশ্যই পুরাণতত্ত্ব।

প্রাচীন পুরাণ বিবেচনাকালে, প্রতিটা যুগান্তকারী আন্দোলন সামান্য ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। কেউ আবার নির্দিষ্ট পৌরাণিক ধারার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে; অন্যেরা Laissez-faire হস্তক্ষেপ না করার রীতি গ্রহণ করে। সবাই নিজ নিজ পুরাণের নৈতিক ব্যাখ্যা আর ভিতরের বিন্যাস নতুন করে সাজায়। শহুরে জীবনের অভ্যাগমের মানে একটাই পুরাণগুলোকে কেউ আর কোনো প্রশ্ন না করে মেনে নেবে না। মানুষ সমালোচকের দৃষ্টিতে এগুলোকে বিশ্লেষণ করা অব্যাহত রাখে কিন্তু তারা যখন আত্মার রহস্যের সম্মুখীন হয়, তারা দেখে যে সহজাত প্রবৃত্তির বলে তারা পুরাতন পুরাণেরই দ্বারস্থ হচ্ছে। গল্পগুলোকে হয়তো নতুন করে লিখতে হবে, কিন্তু এখনও তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। যদি কোনো পুরাণ কোনো কঠোর সংস্কারকের দ্বারা উদ্‌বাসিত হয়, কখনও কখনও সামান্য ভিন্ন আঙ্গিকে পরবর্তী সময়ে সে আবার মূল ধারায় ফিরে এসেছে। এমনকি এই পরিশীলিত ধর্মীয় ব্যবস্থায়, মানুষ দেখে যে পুরাণ ব্যতীত কোনো কিছু করতে তারা অপারগ।

কিন্তু পূর্বপুরুষের ন্যায় মানুষ এখন আর সহজেই দিব্য অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না। প্রাচীন কিছু কিছু শহুরে-বাসিন্দাদের চেতনা থেকে দেবতারা ইতিমধ্যেই বিদায় নিতে শুরু করেছে। অ্যাক্সিয়াল রাষ্ট্রে বসবাসকারীরা এখনও সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আকুল, কিন্তু দিব্য এখন যেন বহুদূরের বস্তু এবং কখনও হয়তোবা ভিনগ্রহের বাসিন্দা। মরণশীল মানুষ আর তাদের দেবতাদের মাঝে এক যোজন ব্যবধান। সেই একই প্রকৃতিতে তারা আর সহাবস্থান করে না; এটা এখন বিশ্বাস করা কঠিন যে দেবতা আর মানুষ একই ঐশ্বরিক উপাদান থেকে সৃষ্ট। প্রাচীন হিব্রু পুরাণে এমন একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতার কথা কল্পনা করা হয়েছিল যিনি খেতে পারেন এবং বন্ধুর ন্যায় আব্রাহামের সাথে কথোপকথন চালিয়ে যেতে সক্ষম।[৬৯] কিন্তু অ্যাক্সিয়াল যুগের পয়গম্বরের দল যখন এই একই দেবতার মুখোমুখি হন, তার কারণে একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তারা, যা তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে বা বিস্মিত বিপর্যস্ত অনুভূতি তাদের মাঝে রেখে যায়।[৭০] পরম বাস্তবতার মাঝে লীন হওয়াটা এখন অসম্ভব রকমের কঠিন মনে হয়। ভারতবর্ষে, বৌদ্ধরা অনুভব করে যে নির্বাণের দিব্য শান্তির জগতে তারা প্রবেশ করতে পারবে কেবল তাদের সাধারণ চেতনার প্রতি যোগাসনের মাধ্যমে ব্যাপক আক্রমণ শাণিত করে যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে, আবার জৈনরা এমন কঠিন তপশ্চর্যা করে যে কেউ কেউ অনাহারের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চীনে, কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, ডাও, পরম বাস্তবতা, মানুষের পৃথিবী থেকে এতটাই আলাদা যে সে সম্পর্কে কথা না বলাই ভালো।[৭১] মৌলিকভাবে পৃথক এসব ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মানে এই যে পুরাণ তার সেই প্রাচীন দেবতাদের সাথে তুলনীয় anthropomorphic উপায়ে দিব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারছে না।

আমাদের আলোচনায় আমরা চীনকে খুব বেশি প্রাধান্য দেইনি কারণ চীনারা তাদের উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতিতে দেবতাদের সম্পর্কে কোনো গল্প বয়ান করে না। ঐশ্বরিক যুদ্ধের কোনো গল্প সেখানে নেই, নেই মৃতাপন্ন দেবতা বা পবিত্র বন্ধন বা বিয়ে; কোনো স্বীকৃত দেবতামণ্ডলী নেই, নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির গল্প বা মানুষের সাথে তুলনীয় দেবতার দল। তাদের শহরগুলোর কোনো পৃষ্ঠপোষক দেবতা থাকত না বা কোনো প্রকার শহুরে প্রার্থনার প্রথা। তার মানে এই না যে চৈনিক সমাজের কোনো পৌরাণিক ভিত্তি নেই। পূর্বপুরুষরা আরাধনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা এমন একটা পৃথিবীর দিকে ইশারা করে যা মানুষের পৃথিবীর চাইতে অনেক পুরাতন। মৃত আত্মীয়স্বজনের আচারঅনুষ্ঠান চাইনিজদের সামাজিক শৃঙ্খলার আদর্শায়িত প্রতিরূপ সরবরাহ করত যা পরিবার হিসাবে কল্পনা করা হয় এবং শিষ্টতার নীতি দ্বারা পরিচালিত হতো। নদী, তারা, বাতাস, আর শস্যাদি সবার মাঝেই আত্মা রয়েছে যা আকাশ দেবতা, ডি (পরবর্তীকালে তিয়েন। 'স্বর্গ' বলা হয়) এর অধীনে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে। অন্যান্য আকাশ দেবতাদের ন্যায় চৈনিক আকাশ দেবতা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়নি। শান্ রাজবংশের সময়ে সে আরও জোরালো হয়ে উঠে (খ্রিঃ পূঃ ১৭৬৬-খ্রিঃ পূঃ ১১২২)। রাজার বৈধতা নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হতো যে কেবল রাজা একাই ডি / তিয়েন এর সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং বারোমেসে দর্শনের নীতি অনুসারে সে ঈশ্বরের পার্থিব প্রতিরূপ– ১৯১১ সালের বিপ্লবের আগ পর্যন্ত চীনা সংস্কৃতিতে এই পুরাণ টিকে ছিল। পার্থিব প্রশাসন স্বর্গীয় ব্যবস্থার অনুরূপ; রাজাকে তার মন্ত্রীরা সাহায্য করে ঠিক যেমন তিয়েনকে ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনায় অনুষঙ্গের দেবতারা সাহায্য করে থাকে।

চাইনিজরা বোধহয় অন্যান্য সংস্কৃতির চেয়ে আগে অ্যাক্সিয়াল মূল্যবোধের দিকে হাতড়ে হাতড়ে পথ চিনে এগিয়ে গিয়েছে। খ্রিঃ পূঃ ১১২৬ সালে উই নদীর অববাহিকার লোকেরা বর্তমানে চীনের সেনসি প্রদেশ, শান বংশকে উৎখাত করে জোউ বংশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিষেক ঘটায়। জোউ দাবী করে যে শান বংশের শেষ রাজা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল এবং মানুষের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে তিয়েন তার ম্যাণ্ডেট জোউকে দিয়েছে– এ পুরাণে তিয়েন নীতিবাদী চরিত্রে অভিষিক্ত। ব্যাপক উৎসব আর শ্রুতিমধুর বাদ্যের সহযোগে স্বর্গের এই আদেশ জোউ উদ্‌যাপিত করে। এই বিধানকে সামাজিক সম্প্রীতির আগমনী হিসাবে দেখা হয় যা কিনা নিজেই ঐশ্বরিক। সব অংশগ্রহণকারীকে জীবিত বা মৃত, এসব অনুষ্ঠান মেনে চলতে হবে। সব অস্তিত্ব– সত্তা, পূর্বপুরুষ, এবং মানুষ– তাদের বিশেষ স্থান রয়েছে, সবাইকে নিজ নিজ পছন্দ অপছন্দকে এবং আচার অনুষ্ঠানের প্রতি ব্যক্তিগত প্রবণতা দমন করতে হবে যা বিশ্বের আদর্শ বিন্যাসকে মানুষের ত্রুটিযুক্ত পৃথিবীতে একটা বাস্তবতার রূপ দিয়েছে। আচার অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ এতে অংশগ্রহণকারীরা নয়; ব্যক্তি মানুষ অনুভব করে পবিত্র জগতের সাথে তারা লীন হয়ে পড়ছে যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি।

কনফুসিয়াসের সময় নাগাদ অবশ্য, জোউ রাজত্ব ভঙ্গুর হয়ে এসেছিল এবং পুরাতন প্রথা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অনীহাই এর কারণ বলে প্রচার করেন কনফুসিয়াস এবং আচরণের (লি) বিধিবদ্ধ নিয়ম গ্রহণ করেন যা মানুষকে শিখাবে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত। এখন মানুষ ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে। কিছু কিছু পুরান পুরাণে উল্লেখ ছিল যে ব্যাক্তিগত আত্মোৎসর্গের উপরে সৃষ্টিশীলতা নির্ভরশীল কিন্তু যুগান্তকারী পর্বের ঋষিরা নৈতিক বোধের এই অন্তর্জ্ঞানকে সুনির্দিষ্ট করে তোলেন। প্রত্যেককে প্রাত্যহিক জীবনে এই আত্মাহুতির অনুশীলন করতে হবে যারা নিজের মানবতাকে নিখুঁত করার ইচ্ছা রাখে।[৭২] কনফুসিয়াস পুরাতন চৈনিক মূল্যবোধের সাথে এই যুগান্তকারী করুণানিধির সংমিশ্রণ ঘটান। তিনি রেন (সহৃদয়তা) এর আদর্শ প্রচার করেন যা দাবী করে মানুষ 'অপর মানুষ'কে ভালোবাসবে।[৭৩] সোনালী আইনের তিনিই প্রথম প্রচারক : 'তুমি যেমন নিজের ক্ষতি করবে না তেমনি অপরের ক্ষতি করতে যেও না'।[৭৪] আত্মনিরীক্ষা আর মনের অভিব্যক্তি অ্যাক্সিয়াল সত্তা দাবী করে নিজের গোপন লুকানো মানসিকতার ইচ্ছাকৃত বিশ্লেষণের জন্য। নিজের চাহিদা প্রথমে বিশ্লেষণ না করে অন্যের সাথে ন্যায্য আচরণ কেউ করতে পারবে না; অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো ও (নিজেকে পছন্দ করা)র একটা প্রক্রিয়া।[৭৫]

কিন্তু কনফুসিয়াস বুঝতে পেরেছিলেন কেবল যৌক্তিক অভিব্যক্তি বা সদিচ্ছা দ্বারা এটা সম্ভব না। সঙ্গীত আর আচারঅনুষ্ঠানের মিলিত রসায়নের মাধ্যমে স্বার্থপরতার চরম বিলুপ্তি অর্জন করা সম্ভব যা অন্যসব মহান কলার ন্যায় মানুষকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করে যা অনুভূতির চাইতে গভীর।[৭৬] অবশ্য কেবল আচারঅনুষ্ঠানে যোগ দেয়াটাই যথেষ্ট না : এর পেছনের উদ্দেশ্যটা বোঝা জরুরী যা অপরের প্রতি 'আনত' (রাঙ) অভিব্যক্তি হৃদয়ে প্রোথিত করবে অহংকার ঈর্ষা এবং ক্ষোভকে অতিক্রম করতে সহায়তা করে।[৭৭] অন্যান্য সদস্যদের প্রতি মাথা নত করে, কৃত্যানুষ্ঠানের দাবী মেনে নিয়ে এবং যখন প্রয়োজন তখন অন্যকে নেতৃত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ দান করে ভক্তের দল– এসবই হবে মহিমাময় সঙ্গীতের সঙ্গতে– তাদের প্রতিবেশী অন্য মানুষের সাথে কি ধরনের আচরণ ও সম্পর্ক সাধারণ পরিস্থিতিতে বজায় রাখতে হবে সেটার শিক্ষা নেয়। অতীতের আদর্শ ব্যবস্থার দিকে কনফুসিয়াস ফিরে তাকান। দেবতাদের সম্পর্কে কোনো গল্প চীনাদের ভিতরে প্রচলিত নেই কিন্তু বীরদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের, যারা বস্তুতপক্ষে পৌরাণিক চরিত্র কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক বলে মনে করা হতো, প্রথা চীনাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। সুদূর অতীতকালের পাঁচ ঋষি রাজার মাঝ থেকে দুজন ছিল কনফুসিয়াসের বিশেষ বীর চরিত্র। প্রথম জনের নাম ইয়াও যে চীনাদের সঙ্গীত আর আচার অনুষ্ঠানের যথাযথ ব্যবহারই কেবল শেখাননি সেই সাথে রাঙের গুণাবলী তাদের সামনে প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের পাঁচ ছেলের কাউকেই যোগ্য না মনে করায় সৎ চাষী শানকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে পছন্দ করেন। শানও অসাধারণ নিঃস্বার্থতার পরিচয় দেয়, তার আপন ভাইয়েরা আর বাবা তাকে হত্যার চেষ্টা করলেও তাদের প্রতি তার ভালোবাসা অক্ষুণ্ন থাকে এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান থেকে তাদের বঞ্চিত করে না।

কিন্তু কনফুসিয়াসের কাছে, আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করাটা এসব পৌরাণিক গল্পের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈদিক ভারতে একই অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, সেখানে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গিত বলীর আচার অনুষ্ঠান মূল উদ্দেশ্যকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় চেতনা থেকে ধীরে ধীরে দেবতারা সরে যায় এবং খ্রি: পূ: অষ্টম শতকের আচার অনুষ্ঠান সংস্কারকের দল নতুন প্রথা প্রবর্তন করে যেখানে ব্যক্তি এককে প্রাধান্য দেয়া হয়। সে কারণে মানুষ সাহায্যের জন্য দেবতাদের উপরে নির্ভর করতে পারে না, আচারের ক্ষেত্রে তাদের একটা আদর্শায়িত পৃথিবী সৃষ্টি করতে হবে নিজেদের জন্য। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত ক্ষমতার যাকে *ব্রাহ্মণ* বলা হয়, অভিজ্ঞতা এতটাই ব্যাপক যে মনে করা হতে থাকে যে দেবতার পরে পরম বাস্তবতার অবস্থান এবং সেটাই জগতের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আজও, ধর্মীয় উৎসব তুরীয় আনন্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম তারা যাকে বলে *অন্য মানস* যা সাধারণ লোকায়ত চেতনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিধিবদ্ধ প্রথার প্রতি চীন আর ভারতবর্ষের গুরুত্ব আরোপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পুরাণকে তার প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করে দেখাটা ঠিক না। পুরাণ এবং আচরিত অনুষ্ঠান সমান সমান অংশীদার, উভয়েই পবিত্রতার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে এবং সাধারণত একই সাথে সেটা করে থাকে তবে কখনও কখনও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে যায়।

যুগান্তকারী ঋষিরা সবাই অবশ্য তৃতীয় আরেকটা উপাদানের কথা বলেছেন। পুরাণের আসল মানে বুঝতে হলে, কেবল আচারগুলো পালন করলেই চলবে না বা একে একটা আবেগঘন অনুরণন দান করে লাভ হবে না, সেইসাথে সঠিক নৈতিক আচরণও জরুরী। কনফুসিয়াস যাকে রেন, রাঙ আর শু বলেছেন সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত কারো প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত না হবে ইয়াও বা শানের মতো পুরাণ ততক্ষণ পর্যন্ত বিমূর্ত অধরা রয়ে যাবে। বৈদিক ভারতে, আচার অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'কর্ম'। বুদ্ধের অবশ্য এধরনের উৎসর্গমূলক আচারে কোনো বিশ্বাস ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন আমাদের সাধারণ প্রতিক্রিয়াকে প্রেরণা দান করে যে ইচ্ছা সেটাই কর্ম।[৭৮] আমাদের প্রেষণা হলো অন্তরের কর্ম, মানসিক কর্ম আচারানুষ্ঠান পালনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাহ্যিক কর্মের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাক্সিয়াল পর্বের এই সময়কাল বিশেষভাবে বৈপ্লবিক, যা নৈতিকতা এবং পুরাণ উভয়ের বোঝাপড়া আত্তীকরণে সাহায্য করে। পুরাণ সবসময়ে কর্ম দাবী করে। বৈপ্লবিক যুগের ঋষিরা বোঝাতে চেয়েছেন যে পুরাণের মূল অর্থ আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে না যতক্ষণ না প্রাত্যহিক জীবনে ন্যায়বিচার এবং অপরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের চর্চা আয়ত্তে না আসবে।

ডাও ডে জিঙের খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকের লেখক, সনাতনভাবে তাকে লাওজি বলা হয়, প্রথাগত আচারঅনুষ্ঠানকে তিনিও বিরূপ দৃষ্টিতেই দেখছেন। লি'র পরিবর্তে তিনি মনঃসংযোগের অভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন যা অনেকটা ভারতীয় যোগব্যায়ামের মতো। তার স্থির বিশ্বাস ছিল, সভ্যতা একটা বিরাট ভুল, যা মানুষকে সত্যের পথ (ডাও) থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কৃষিজীবী সরলতার সোনালী দিনের দিকে পেছন ফিরে তাকান লাওজি, যখন মানুষ ছোট ছোট গ্রামে বাস করত, কোনো প্রযুক্তি ছিল না, ছিল না শিল্পকলা বা সংস্কৃতি, যুদ্ধও ছিল না।[৭৯] শেননঙ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর সাথে সাথে এই সোনালী দিনের যুগ শেষ হয়েছে বলে চীনারা বিশ্বাস করত, যিনি, নিজে অমানবিক পরিশ্রম করে মানুষকে কৃষিকাজ শিখিয়েছিল। শেননঙ সব উদ্ভিদ খেয়ে দেখেছে কেবল জানতে যে কোনটা সহজপাচ্য এবং সেটা করতে গিয়ে একবার একদিনে সত্তর বার বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছিল। খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতক নাগাদ যখন শক্তিশালী রাজারা ছোট ছোট রাজ্য আর গ্রাম একের পর এক বিধ্বংসী যুদ্ধে জয় করে নিচ্ছে তখন শেননঙের পুরাণ ভাষ্য বদলে যায়। তখন তাকে আদর্শ শাসক হিসাবে অভিহিত করা শুরু হয়। বলা হতে থাকে, একটা সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য তিনি শাসন করেছেন, যেখানে প্রজাদের পাশে মাঠে লাঙল চষেছেন, এবং কোনো মন্ত্রী বা আইন আর শাস্তির ভয় ব্যতীত তিনি শাসন কাজ পরিচালনা করেছেন। আদর্শবাদী তপস্বীর দল শেন নঙের আদর্শ পুনরায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামাজিক জীবন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয় এবং ডাও ডে জিঙ যা ছোটখাটো রাজ্যের নৃপতির উদ্দেশে লিখিত সেখানেও একই উপদেশ দেখা যায়। পিছু হটে আসাই উত্তম, অনাড়ম্বর জীবনযাপন কর এবং কুটোটিও নাড়িও না যতক্ষণ না মহান শক্তিগুলো উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নিজেদের ধ্বংস না করছে।

কিন্তু অন্য সব যুগান্তকারী শিক্ষকের ন্যায়, লাওজি কেবল বেঁচে থাকার বাস্তবতা নিয়ে উদগ্রীব ছিলেন না, কিন্তু পৃথিবীর উত্থানপতনের মাঝে একটা সর্বব্যাপী শান্তির উৎস খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন। পরম বাস্তবতার অভিকাঙ্ক্ষী হন তিনি, ডাও, যার ব্যাপ্তি দেবতাদেরও ছাড়িয়ে যায় এবং যা সব অস্তিত্বের অবর্ণনীয় ভিত্তি। আমরা যা কিছু ধারণা করতে পারি এটা তার সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় এবং তারপরেও যদি আমরা আমাদের ভিতরে একটা শূন্যতার চাষ করি, কোনো ধরনের স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা এবং লোভ ছাড়া সমবেদী জীবনযাপন করি তাহলে আমরা ডাও আত্মস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারব এবং এভাবেই রূপান্তর ঘটবে। আমরা যখন সভ্যতার লক্ষ্য কেন্দ্রিক মূল্যবোধ পরিত্যাগ করবো কেবল তখনই আমরা জীবন যেমন হওয়া উচিত তার সাথে খাপ খাওয়াতে পারবো।[৮০] আবার লাওজি যেমন শেননঙের পৌরাণিক সোনালী দিন কামনা করছেন আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে, তিনি সনাতন পুরাণের কাছেও আবেদন জানান (যা হয়তো এখনও বর্তমান সংস্কৃতিতে জনপ্রিয়) ডাওকে জাগ্রত করতে। ডাও হলো জীবনের উৎস, নিখুঁত পূর্বপুরুষ এবং একই সাথে মা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ মহান মাতাকে দেখতো চণ্ড এবং রুদ্ররূপে কিন্তু নতুন যুগান্তকারী সত্তা, লাওজি তার চরিত্রে করুণার গুণাবলী আরোপ করেন। তাকে নিঃস্বার্থপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় যা সত্যিকারের সৃষ্টিশীলতা থেকে অচ্ছেদ্য।[৮১] প্রাগৈতিহাসিক নারী ও পুরুষ ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে মাতৃজঠরে ফিরে যাবার অভিনয় করেছে কখনও কখনও, সভ্য মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে সেই একই ফিরে যাওয়া মূর্ত করে তুলতে চেয়েছে।

লাওজি আর বুদ্ধদেব দুজনেই পুরাতন পুরাণগুলো লোকদের নতুন ধারণা বোঝাবার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। পশু উৎসর্গ করা কেবল অর্থহীনই না নিষ্ঠুর বলেও বিশ্বাস করতেন এবং বুদ্ধ সনাতন বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের নির্মম সমালোচনা করেছেন যদিও সনাতন পুরাণের ব্যাপারে তিনি সহনশীল ছিলেন। দেবতাদের উপযোগিতা অবশিষ্ট আছে বলে তিনি মোটেই বিশ্বাস করতেন না এবং নিরবে তাদের একপাশে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি দেবতাদের একটা নতুন প্রতীকী গুরুত্ব দান করেছেন। তার জীবনের কিছু কিছু গল্পে, দেবতাদের রাজা ব্রহ্মা বা মৃত্যুর দেবতা মরা, তার নিজের মনের অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে বলে মনে হয় বা মানসিক শক্তির টানাপোড়েনে ব্যক্তিরূপ আরোপিত হয়েছে।[৮২]

কিন্তু ইসরাইলের পয়গম্বরেরা এমন নমনীয় মনোভাব দেখাননি। যুগান্তকারী সংস্কারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যা কিছুই তারা দেখেছেন পুরান পুরাণে তাকে নাকচ করতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইসরালাইটসরা, নিকট প্রাচ্যের আচার অনুষ্ঠান আর পৌরাণিক জীবনযাপন করছিল আশেরাহ্ রাআল, এবং ইশতার সাথে সাথে নিজস্ব দেবতা ইয়াহ্ওয়েহ্ এর অর্চনা করে। কিন্তু এখন ইয়াহ্ওয়েহ্কে দূরাগত স্মৃতি মনে হতে থাকলে, হোসা, জেরেমিয়াহ্ এবং এজিকিয়েলের ন্যায় পয়গম্বরের দল, দেবতাদের লক্ষণযুক্ত পুরাতন পুরাণসমূহের মৌলিক সংশোধনের কাজ হাতে নেন। পুরাতন কাহিনীগুলোকে মূল্যহীন মনে হওয়ায় তারা এসবকে মিথ্যে বলে ঘোষণা করেন। তাদের দেবতা ইয়াহ্ওয়েহ্ যার মহান ব্যাপ্তির কাছে এসব পুরাতন গল্পের অসারত্ব প্রমাণিত হয়েছে বিধায় সেই একমাত্র দেবতা। পুরাতন ধর্মের বিরুদ্ধে তারা বিপ্রতিপত্তিক অবস্থান গ্রহণ করেন। ইয়াহ্ওয়েহ্কে, দিব্য সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মরিয়া এমনভাবে চিত্রিত করা হয়, কারণ দেখানো হয় তার সমকক্ষ অন্য দেবতারা করুণা এবং ন্যায়বিচারের অ্যাক্সিয়াল গুণাবলী অবহেলা করেছে এবং সে কারণে তাদের মরণশীল মানুষের ন্যায় মৃত্যু হবে।[৮৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানীয় পৌত্তলিক দলগুলোকে জশুয়া, ডেভিড এবং রাজা জোশিয়ার ন্যায় সাংস্কৃতিক বীরের দল প্রবলভাবে দমন করেন,[৮৪] এবং বাআল আর মারডুকের মূর্তিগুলোকে মানুষের তৈরি বলে উপহাস করা হয় যা ছিল পুরো সোনা আর রূপা নির্মিত এবং কয়েক ঘন্টার ভিতরে শ্রমিকের দল তাদের গুড়িয়ে দেয়।[৮৫]

এটা অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের পৌত্তলিকতার একটা সরল উপস্থাপনা। কিন্তু ধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, একবার যদি কোনো পুরাণ মানুষের মাঝে ব্যাপ্তির অনুভূতি আরোপ করতে ব্যর্থ হয়, সেটা তখন ঘৃণিত বলে বিবেচিত হতে থাকে। একেশ্বরবাদ, কেবল একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস, এর শুরুটা ছিল সংগ্রামমুখর। ইসরালাইটসদের অনেকে এখনও পুরাতন পুরাণসমূহের প্রতি টান অনুভব করেন এবং এটা কাটাতে তাদের রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় নিজের সাথে। তারা মনে করে প্রতিবেশীদের পৌরাণিক জগৎ থেকে তাদের জোর করে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং তারা বহিরাগতে পরিণত হয়েছেন। জেরেমিয়াহ্‌র দুর্দশার সময় আমরা এর রেশ বেশ অনুভব করতে পারি, যিনি ঈশ্বরকে ব্যথার মতো অনুভব করেছিল যা তার পুরা দেহকে কাঁপিয়ে ছেড়েছে, বা এজিকিয়েলের অদ্ভুত পেশা, যার জীবন ধারাবাহিকতা হীনতার মৌলিক স্মারকে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর এজিকিয়েলকে আদেশ করেছিলেন পশুবিষ্ঠা ভক্ষণ করতে; মৃত স্ত্রীর জন্য শোক প্রকাশ করতে তাকে বাধা দেয়া হয়েছিল। ভয়ংকর অনিয়ন্ত্রিত কাঁপুনি সে অতিক্রম করেছে। যুগান্তকারী পয়গম্বরের দল অনুভব করেছিলেন যে, তারা মানুষকে একটা অজানা জগতে নিয়ে চলেছে যেখানে কোনো কিছুই নিশ্চিত না এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু একটা সময় পরে এই দুর্দশা প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসে পরিণত হয় এবং আমরা এখন যাকে ইহুদি ধর্ম বলি সেটার জন্ম হয়। বিড়ম্বনা হলো এক বিশাল দুর্যোগের পরেই কেবল এই নতুন আত্ম-প্রত্যয়ের জন্ম হয়। ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজার জেরুজালেম শহর দখল করেন, এবং ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র মন্দির গুড়িয়ে দেন, অধিকাংশ ইসরালাইটসকে ব্যাবিলোনিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়, নির্বাসিতেরা সেখানে বিশালাকার মিনারযুক্ত মন্দিরের মুখোমুখি হয় এবং শহরের সমৃদ্ধ বিধিবদ্ধ জীবন প্রথমবারের মতো দেখে আর দেখে ইসাগলিয়ার বিশাল মন্দির। কিন্তু পৌত্তলিকতা এখানেই তার আকর্ষণ হারায়। জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই নতুন সত্তাকে দেখি, সম্ভবত তথাকথিত ঋষিদের কোনো সদস্যের লেখা, যা পুরাতন যুধ্যমান সৃষ্টি এবং বিবর্তন তত্ত্বের বিপরীতে একটা শান্ত, সমাহিত বিসংবাদ। সুস্থির শ্রেণীবদ্ধ গদ্যে, এই নতুন সৃষ্টি পুরাণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্যাবিলোনীয় সৃষ্টি তত্ত্বকে প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করায়। মারডুকের ন্যায়, ইসরাইলের ঈশ্বরকে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য বেপরোয়াভাবে লড়াই করতে হয়নি; অনায়াসে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কেবল একটা আদেশের মাধ্যমে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা কেউই আর ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র প্রতি বিরূপ মনোভাবপূর্ণ দেবতা নন। তারা তার অধীন এবং কেবলমাত্র ব্যবহারিক কারণে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তিয়ামাত কোনো সমুদ্রদানব না কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তার আজ্ঞাধীন। মারডুকের তুলনায় ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র সৃষ্টি এতটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিমান্বিত যে তাকে আর দ্বিতীয়বার কিছু করতে হয়নি বা কোনো পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়েনি। বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যাবিলনের দেবতারা যখন যুদ্ধে রত এবং নবান্নের আচার অনুষ্ঠান জরুরী হয়ে পড়েছে তাদের শক্তি উজ্জীবিত করতে সেখানে ইয়াহ্ওয়েহ্ তার কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিতে পারেন।

ইসরালইটসরা অবশ্য সুবিধামতো স্থানে মধ্যপ্রাচ্যের পুরাতন পুরাণ ব্যবহার করতে পারলে খুশীই হয়। যাত্রা পুস্তকে, আগাছাপূর্ণ সমুদ্র অতিক্রমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে একটা পুরাণের আঙ্গিকে।[৮৬] অতিক্রমের আচার হিসাবে অম্বুদীক্ষা সনাতনভাবে প্রচলিত ছিল; অন্য দেবতারা পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে সমুদ্রকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন– যাত্রা পুরাণে অবশ্য পৃথিবীর বদলে মানুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আমরা যাকে দ্বিতীয় ইশায়াহ্ বলি, ষষ্ঠশতকের মাঝামাঝি নাগাদ যিনি ব্যাবিলনে সক্রিয় ছিলেন, তিনি পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীনভাবে একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করেছেন। মাত্রাতিরিক্ত কর্কশ কিছু না; তার মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে ইয়াহ্ওয়েহ্ই একমাত্র ঈশ্বর; তার বিরুদ্ধ মনোভাব তিরোহিত হয়েছে। অবশ্য তার পরেও তিনি পুরাতন সৃষ্টি পুরাণের দ্বারস্থ হন যেখানে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য ইয়াহ্ওয়েহ্র এই বিজয়কে নিষ্ক্রমণের সময় আগাছাপূর্ণ সমুদ্রকে দু'ভাগ করার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ইসরালাইটসরা এখন দিব্যশক্তির এমনই একটা প্রদর্শনী আশা করে যেখানে ঈশ্বর নির্বাসন রদ করে তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। গিলগামেশের মহাকাব্যের ব্যাবিলনীয় লেখক প্রাচীন ইতিহাস আর পুরাণ এক করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় ইশায়াহ্ আরো এগিয়ে যায়। তিনি তার ঈশ্বরের আদিকালিক কর্মকাণ্ডকে বর্তমান ঘটনার সাথে জুড়ে দেন।[৮৭]

গ্রীসে, যুগান্তকারী সময়টা লোগোস (যুক্তি) দ্বারা তাড়িত, পুরাণ থেকে মনের বিভিন্ন স্তরে যা কাজ করে। আর্চে বা কোনো প্রকার আচার অনুষ্ঠানের সহযোগিতা যেখানে প্রয়োজন হয় পুরাণের মানে বুঝতে সেখানে লোগোস সতর্কতার সাথে যাচাই করে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যার আবেদন কেবল সমালোচক বুদ্ধিবৃত্তির কাছেই আছে। গ্রীক উপনিবেশ ইওনিয়ায় যা বর্তমান তুরস্ক, প্রথম পদার্থবিদ পুরাতন বিশ্ব পুরাণের যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে দেখার প্রয়াস নেন। অবশ্য এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা পুরাতন পৌরাণিক আর আদিরূপ কাঠামোর ভিতরেই আটকে থাকে। একদিক থেকে দেখতে গেলে এনুমা এলিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা বিশ্বাস করত পৃথিবী কোনো আদিকালিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়েছে কোনো দিব্য প্রচেষ্টা দ্বারা না, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক নিয়মের কারণে এই রূপান্তর ঘটেছে। অ্যানাক্সিমান্দারের কাছে (খ্রিঃ পূঃ ৬১১-৫৪৭) মূল আর্চে (নীতি) আমাদের মানবিক অভিজ্ঞতার মতো কোনো ঘটনা না। তিনি এর নাম দেন অনন্ত, উষ্ণতা শীতলতার পর্যায়ক্রমিক পারস্পরিক ক্রিয়ায় আমাদের পরিচিত উপাদানগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এ্যানাক্সিমেনেস (খ্রিঃ পূঃ ৫০০) বিশ্বাস করতেন আর্চে হলো অনন্ত বাতাস; হেরাক্লিটাস (খ্রিঃ পূঃ ৫০০) মনে করতেন আগুন। পুরাতন পুরাণের ন্যায় এসব প্রাথমিক ধারণার পুরোটাই কাল্পনিক, কারণ যাচাই করার কোনো উপায় ছিল না। কবি জেনোফেনেসও (খ্রিঃ পূঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৪০-৫০০) এটা উপলব্ধি করেন এবং মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতার কথা বলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন একটা যৌক্তিক ধর্মশাস্ত্র প্রণয়নের, দেবতাদের সম্বন্ধে প্রচলিত লোকায়ত পুরাণ নাকচ করে এবং phusikoi এর বিজ্ঞানের সাথে খাপ খায় এমন দেবতার অধিষ্ঠান করতে তিনি চেয়েছিলেন : বিমূর্ত, ছদ্মবেশী শক্তি, নৈতিক কিন্তু স্থির, সর্বজ্ঞ এবং শক্তিমান।

ইওনিয়ান পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে খুব কম লোকই আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা ছিল গ্রীসের প্রথম যুগান্তকারী সত্তার প্রদর্শন। চতুর্থ শতকে দর্শনের প্রতি আগ্রহ জোরালো হবার আগে, এথেন্সবাসীরা একটা নতুন ধরনের কৃত্যানুষ্ঠানের প্রচলন করে, বিয়োগান্তক নাট্যকল্প, ধর্মীয় উৎসবের আবহে প্রাচীন পুরাণের ভাবগম্ভীর উপস্থাপন কিন্তু একই সাথে গভীরভাবে তাকে খুটিয়ে দেখার প্রয়াস। একিলাস (খ্রিঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬) সফোক্লিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৯৬-৪০৫) এবং ইউরেপিডিস (৪৮০-৪০৬) সবাই ঈশ্বরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, আর দর্শকেরা বিচারের ভূমিকায় আসীন। পুরাণ নিজেকে প্রশ্ন করে না, সে একপ্রকার আত্মপরিচয় দাবী করে। ট্রাজেডি অবশ্য সনাতন পুরাণ আর নিজের ভিতরে এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং কয়েকটা মৌলিক গ্রীক মূল্যবোধের বিষয় খতিয়ে দেখে। দেবতারা কেনো ন্যায়পরায়ণ আর ঠিক? বীরত্ব, গ্রীকনেস বা গণতন্ত্রের মূল্য কি? নগর রাষ্ট্রের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার কাছে পুরাণ যখন পরাজয় মেনে নিচ্ছে ঠিক সেই সময়ে ট্রাজেডির আগমন ঘটেছে। অডিপাসের মতো বীর তখনও সনাতন পৌরাণিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল কিন্তু তারা তাকে তার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে না। পৌরাণিক বীরেরা যেমন যুদ্ধ করে বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায় বা ন্যূনতম মাত্রায় হলেও দৃঢ়তা দেখাতে পারেন, ট্রাজিক বীরের ক্ষেত্রে সে ধরনের সমাধান প্রযোজ্য না। ব্যথা আর বিভ্রান্তির সাথে দোদুল্যমান অবস্থায়, নায়ককে সচেতনভাবে পছন্দ বেছে নিয়ে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে।

প্রতিমা প্রখার বিরোধী হলেও, সনাতন রীতিতেই ট্রাজেডি লেখা হয়। কোনো ধর্মীয় আচারের ন্যায়, বিচ্ছিন্ন দুঃখকে ভাগ করে নেয়ার প্রয়াস এতে উপস্থাপিত কিন্তু প্রথমবারের মতো শহরের ধর্মীয় জীবনে অন্তরের ভাব সংযুক্ত হলো। ডিওনিসিসের উৎসবের সময় নাটক মঞ্চস্থ হতো এবং এথেন্সের যুবকদের উদ্দীপ্ত করতে আর তাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। পরিচিত দীক্ষা অনুষ্ঠানের ন্যায়, ট্রাজেডি দর্শকদের অবর্ণনীয় আর চরম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করতো। উৎসর্গের আদর্শের ন্যায় অনেকটা যেহেতু এটা Katharsis-এর দিকে নিয়ে যেত, করুণা আর ভয়ের অনুভূতির দ্বারা হৃদয় ও মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে আত্মিক পরিশোধনে যার সমাপ্তি। কিন্তু উৎসর্গের এই নতুন রূপ অ্যাক্সিয়াল সমবেদনার সাথে সম্পৃক্তকরণ দর্শককে অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে অনুভব করতে শিখাতো, আর এভাবে তাদের মানবতা আর সহানুভূতির পরিধির বিস্তার ঘটতো।

প্লাটো ট্রাজেডি অপছন্দ করতেন এর আবেগপ্রবণতার কারণে, তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মার অযৌক্তিক অংশকে এটা পরিপূর্ণ করে এবং লোগোসের মাধ্যমেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ কেবল নিজের সম্পূর্ণ সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে পারবে।[৮৮] পুরাণকে তিনি পুরাতন স্ত্রীর গল্পের সাথে তুলনা করেছেন। কেবল যৌক্তিক আলোচনাই সত্যিকারের বোঝাপড়ার জন্ম দিতে পারে।[৮৯] প্লাটোর চিরন্তন ধারণার সূত্রকে প্রাচীন দিব্য আদিরূপ পুরাণের দার্শনিক সংস্করণ ধরা যেতে পারে, পার্থিব বস্তু যার ন্যূনতম রূপ। কিন্তু প্লাটো মনে করতেন পুরাণ বা আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্জ্ঞান দ্বারা প্রেম, সৌন্দর্য্য, ন্যায়বিচার বা ভালোকে অনুধাবন বা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব না সেটা কেবল মনের যুক্তিপাতের শক্তি দ্বারা সম্ভব। এরিস্টোটলও প্লাটোর মতবাদ মানতেন। পুরাতন পুরাণ তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হতো : 'কারণ তারা দেবতাদের বা তাদের থেকে সঞ্জাতকে প্রথম নীতি বলে মেনে নিয়েছিল এবং বলেছিল যে অমৃত আর অমৃতের স্বাদ যে লাভ করেনি সে মরণশীল... কিন্তু এসব কারণের সত্যিকারের প্রয়োগ বিবেচনা করলে, এসব উদ্ধৃতি আমাদের বোধগম্যতার বাইরে'। দার্শনিক ভাষ্য মনে করে এরিস্টোটল পুরাণ পাঠ করতেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব পুরাণ গাঁজাখুরির নামান্তর এবং সত্যের একনিষ্ঠ সন্ধানীর উচিত 'প্রয়োগ দ্বারা যুক্তি অবতারণা করে সেদিকে মনোযোগ দেয়া'।[৯০] আপাতদৃষ্টিতে এখন মনে হয় লোগোস আর মিথোসের ভিতরে দর্শন পাঠ একটা টানাপোড়েনের জন্ম দিয়েছে, যা এযাবৎ কাল পর্যন্ত পরিপূরক ছিল।

কিন্তু এটাও পুরো সম্পূর্ণ না। পুরাণের উপর যতই বিরক্ত থাকুক, ধারণার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্লাটো একে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছিলেন যা দার্শনিক ভাষার পরিধির বাইরে অবস্থিত। লোগোসের ভাষা ব্যবহার করে আমরা শুভ সম্বন্ধে কিছু বলতে অপারগ কারণ এটা কোনো সত্তা না, কিন্তু একইসাথে সত্তা আর জ্ঞানের উৎস। আরো ব্যাপার আছে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা দেবতাদের জন্ম যা আপাতদৃষ্টিতে অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় এবং অযৌক্তিকতা দ্বারা এতটাই জারিত যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তর্কে তাদের প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই বিষয়বস্তু দার্শনিক গণ্ডির বাইরে চলে গেলে, গ্রহণযোগ্য রূপকথা দ্বারা আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।[৯১] প্রাচ্যের পুরাতন পুনরুত্থানের ও পুরাণের দ্বারস্থ হন প্লাটো।[৯২] এরিস্টোটল স্বীকার করেন যে, দেবতা সম্পর্কিত কিছু কিছু পুরাণ পরিষ্কার বানোয়াট হলেও, এই প্রথার ভিত্তি 'যে প্রথম সব উপাদানই ছিল দেবতা'– এটা 'সত্যিই ঐশ্বরিক'।[৯৩]

পশ্চিমা চিন্তায় তাই একটা অসঙ্গতি রয়েছে। গ্রীক লোগোস পুরাণ বিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু দার্শনিকেরা পুরাণ ব্যবহার অব্যাহত রাখেন, হয় যৌক্তিক চিন্তার প্রাচীন প্রতিনিধি হিসাবে বা ধর্মীয় আলোচনায় তাকে অচ্ছেদ্য আখ্যা দিয়ে। গ্রীক যুক্তিপাতের বিপুল অর্জন সত্ত্বেও অ্যাক্সিয়াল সময়ে গ্রীক ধর্মের উপর এর কোনো প্রভাব ছিল না। গ্রীকরা দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা অব্যাহত রাখে, এ্যলুসিনিয়ান রহস্যময়তায় অংশ নেয়, তাদের উৎসব ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বজায় রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত এই পৌত্তলিক ধর্ম জোরপূর্বক সম্রাট জাস্টিনিয়ান দমন করে খ্রিস্টান মতবাদের মিথোস আরোপ না করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. যুগান্তকারী পর্বের পরবর্তী সময়
(খ্রিঃ পূঃ ২০০০-১৫০০)

আমাদের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে এখন পর্যন্ত প্রধান প্রধান সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক আর আধ্যাত্মিক বিপ্লবের প্রতি আমরা আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছি যা মানুষকে তাদের পৌরাণিক তত্ত্ব সংশোধনে বাধ্য করেছে। যুগান্তকারী অ্যাক্সিয়াল যুগের পরের হাজার বছরে তুলনা করার মতো কোনো পরিবর্তন হয়নি। আধ্যাত্মিক আর ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা এখনও যুগান্তকারী সময়ের ঋষি আর দার্শনিকদের অন্তর্জ্ঞানের উপর নির্ভর করি এবং ষোড়শ শতকের পূর্ব পর্যন্ত পুরাণের পরিস্থিতি মূলত অপরিবর্তিত থাকে। এই ইতিহাসের বাকী অংশে আমরা পশ্চিমে মনোযোগ নিবদ্ধ করবো, নবমার্গের পরবর্তী পর্যায় এখান থেকে শুরু হয়েছে বলেই কেবল না, কিন্তু একই সাথে পশ্চিমের মানুষ এই সময় পুরাণ নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তেও শুরু করেছে। পশ্চিমের ধর্মও আমরা খুটিয়ে দেখবো, কারণ একেশ্বরবাদের তিনটি মতবাদের দাবী, কিছুটা হলেও, ইতিহাসের চেয়ে পুরাণের উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য প্রধান মতবাদে পুরাণের প্রতি এমন যুগপৎ মতবাদের প্রভাব কম। হিন্দু মতবাদে, ইতিহাসকে ক্ষণস্থায়ী আর অলীক হিসাবে দেখা হয় আর সে কারণে আধ্যাত্মিক বিবেচনায় গুরুত্বহীন। পুরাণের আদি মৌলিক পৃথিবীতে হিন্দুরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। বৌদ্ধ মতবাদ গভীর মনোবৈজ্ঞানিক ধর্ম, এবং পুরাণকে মনোবিদ্যার প্রাচীন ধারা বলে মনে করে, দুটো বেশ সদৃশ। কনফুসিয়াসের মতবাদে, পুরাণের ভাষ্যের চেয়ে আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সবসময় বেশি। কিন্তু খ্রিস্টান, ইহুদি আর মুসলমানেরা বিশ্বাস করে ইতিহাসে তাদের ঈশ্বরের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে এবং এই পৃথিবীর বাস্তব ঘটনায় তাকে অনুভব করা সম্ভব। এসব ঘটনা কি আদতেই ঘটেছিল নাকি এগুলো সবই 'পুরাণে'র অংশ? পুরাণের প্রতি এই অস্বস্তিকর মনোভাবের কারণে প্লাটো আর এ্যারিস্টোটলের হাত ধরে যা পশ্চিমা মননে প্রবেশ করেছে, একেশ্বরবাদীরা কিছু সময় পর পর দর্শনের যুক্তিপাতের সাথে ধর্মকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চেষ্টা করাটা ভুল হয়েছে।

অন্য পুরাণের প্রতি ইহুদি মতবাদের মনোভাব অনেক স্ববিরোধিতায় ক্লিষ্ট। অন্য জাতির পুরাণের প্রতি একে শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু কখনও কখনও ইহুদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবধারা প্রকাশ করতে তারা এসব বিদেশী গল্পের সাহায্য অকাতরে নিয়ে থাকে। আর তাছাড়া ইহুদি মতবাদ আরো পুরাণের সৃষ্টিকে প্রবুদ্ধ করা অব্যাহত রেখেছে। তার মধ্যে একটা হলো খ্রিস্টানধর্ম। যীশু আর তার প্রথম দিকের শিষ্যরা সবাই ছিল ইহুদি আর ইহুদি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী, যেমন সেন্ট. পল, যিনি যীশুকে বলা যায় প্রায় পৌরাণিক চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। যদিও মর্যাদাহানিকর কোনো ইচ্ছা থেকে না। যীশু ছিলেন একজন সত্যিকারের ঐতিহাসিক চরিত্র, ৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রোমানরা তাকে হত্যা করেছিল এবং তার প্রথম শিষ্যরা নিশ্চিতভাবে ভেবেছিল যে তিনি– কোনো একটা অর্থে মৃত্যু থেকে জাগ্রত হয়েছেন। একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে যতই পৌরাণিকায়ন করা হোক এটা কখনও ধর্মীয় উৎসাহের উৎস হতে পারে না। পুরাণ হলো একটা ঘটনা যাকে স্মরণ করা হবে যা– কোনো এক অর্থে– একদা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু যা একই সাথে সব সময়ে ঘটছে। একটা ঘটনাকে মুক্ত হতে হবে, যেভাবে ঘটেছিল, একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডি থেকে এবং সমসাময়িক উপাসকদের জীবনে আনয়ন করতে হবে নতুবা এটা একটা অনন্য, পুনরাবৃত্তিহীন ঘটনা হিসাবে রয়ে যাবে বা একটা ঐতিহাসিক খেয়াল যা সত্যিকারের অর্থে কারো জীবন স্পর্শ করতে অপারগ। আমরা জানি না মিশর থেকে পালাবার সময়ে এবং সি অব রীড অতিক্রমকালে ইসরাইলের মানুষের ভাগ্যে কি ঘটেছিল কারণ গল্পটা একটা পুরাণের মতো করে লেখা হয়েছে। পাসওভারের আচার আনুষ্ঠানিকতা বহু শতাব্দী ধরে এই কাহিনীকে ইহুদিদের আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত করেছে যা তাদের বলেছে যে তারা নিজেদের প্রত্যেককে মিশর থেকে পালিয়ে আসা বংশধর বলে মনে করবে। একটা পুরাণকে রূপান্তরকারী আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না, যা বংশ পরম্পরায় উপাসকদের হৃদয়ে এবং জীবনে একে বাঁচিয়ে রেখেছে। পুরাণ যজ্ঞ দাবী করে : যাত্রা পুস্তকের পুরাণ দাবী করে যে ইহুদিরা স্বাধীনতাকে পবিত্র বলে সম্মান করবে এবং অপরের নিপীড়ন আর তাদেরকে দাসে পরিণত করার প্রয়াসে বাধা দেবে। আচার অনুষ্ঠান এবং নৈতিক স্বীকৃতি দ্বারা, গল্পটা অতীতের কোনো ঘটনা হিসাবে বিদ্যমান না থেকে একটা জীবন্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

যীশুর সাথে সেন্ট পলও একই কাজ করেছেন। যীশুর শিক্ষা সম্বন্ধে তার খুব একটা উৎসাহ ছিল না, যা তিনি সামান্যই উদ্ধৃত করতেন, তার পার্থিব জীবন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। 'আমরা যদি কখনও রক্ত মাংসের যীশুকে জেনেও থাকি,' কোরিন্থিয়ানের ধর্মান্তরিতদের উদ্দেশে তিনি লেখেন, 'এখন তাকে আর আমরা সেভাবে জানি না'।[৯৪] গুরুত্বপূর্ণ হলো তার মৃত্যু আর পুনরুত্থান সংক্রান্ত 'রহস্য' (গ্রীক *মিথোস* আর এই শব্দটা একই উৎস থেকে আগত)। পল যীশুকে রূপান্তরিত করে, অনন্ত পৌরাণিক বীরে পরিণত করেন, মারা গিয়ে নতুন জীবনে যার উত্থান হয়েছে। তাকে ক্রুশবিদ্ধকরণের পরে, যীশু ঈশ্বর কর্তৃক একটা অনন্য উচ্চতর মাত্রা লাভ করেন, অস্তিত্বের ঊর্ধ্বতর মার্গে 'আরোহণ' তিনি অর্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন।[৯৫] কিন্তু সবাই যারা আব্দুদীক্ষার আচার অনুষ্ঠানে অংশ নেয় (পানিতে অবগাহন করিয়ে সনাতন রূপান্তরিতকরণ) যীশুর মৃত্যুতে প্রবেশ করে তার নতুন জীবন ভাগ করে নেয়।[৯৬] যীশু এখন আর কেবলই একটা ঐতিহাসিক চরিত্র না কিন্তু খ্রিস্টানদের জীবনে একটা আধ্যাত্মিক বাস্তবতা, আচার অনুষ্ঠান আর নৈতিক অনুশাসন দ্বারা জীবনযাপন করে তারা তার মতো নিঃস্বার্থ জীবন পেতে চায়।[৯৭] 'রক্তমাংসের' যীশুকে খ্রিস্টানরা আর চেনে না কিন্তু আগমন বার্তা আর অন্যান্য শ্লোক পাঠ করে অন্য মানুষের মাঝে তারা তাকে খুঁজে পায়।[৯৮] তারা জানে এই পুরাণটা সত্যি, ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকার কারণেই কেবল না, তাদের নিজেদেরও রূপান্তরের অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেও। এভাবে যীশুর মৃত্যু আর 'জেগে ওঠা' একটা পুরাণ, এটা একদা যীশুর জীবনে ঘটেছিল এবং এখন সব সময়ে ঘটে চলেছে।

খ্রিস্টানধর্ম অ্যাক্সিয়াল যুগের একেশ্বরবাদের পরবর্তী সময়ের পুনরুক্তি; আরেকটা হলো ইসলাম ধর্ম। মুসলমানেরা মহানবী (সঃ) (৫৭০-৬৫২)কে যীশু এবং বাইবেলীয় দৈবজ্ঞদের উত্তরসূরী বলে মনে করে। পবিত্র কুরআন শরীফ, আরবদের মাঝে নাযিল হওয়া পবিত্র গ্রন্থ, তার সাথে পুরাণের কোনো সমস্যা নেই। এর প্রতিটা শ্লোককে *আয়াত* বলা হয়, নীতিগর্ভ রূপকের আকারে রচিত। দৈবজ্ঞদের সম্বন্ধে সব কাহিনী– নূহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ) বা ঈসা (আঃ)– সব আয়াত, 'নীতিগত রূপকের উপমা,' কারণ ঐশ্বরিক সম্বন্ধে আমরা কেবল প্রতীক আর স্মারকের সাহায্যে কথা বলতে পারি। আরবী শব্দ কুরআনের মানে 'আবৃত্তি'। অন্যান্য লোকায়ত গ্রন্থের ন্যায়, তথ্যের জন্য নিভৃতে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ঠিক না, মসজিদের পবিত্র পরিবেশে এর পাঠ আবশ্যক এবং যতক্ষণ না একজন মুসলমান এর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জীবনযাপন না করবে কুরআনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য তার কাছে প্রতিভাত হবে না।

ঐতিহাসিক ধর্মের এই পৌরাণিক মাত্রার কারণে, ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুসলমানেরা তাদের অন্তর্জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে বা কোনো সংকটের সমাধান খুঁজে পেতে আজও পুরাণের দ্বারস্থ হয়। তাদের সব মরমীবাদীরাই পুরাণের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। মরমীবাদ পুরাণ এবং রহস্যময়তা সবই গ্রীক শব্দ Musteion-এর সাথে সম্পর্কিত : 'মুখ বা চোখ বন্ধ করে'। সবই সেইসব অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত করে যা অস্পষ্ট আর অবর্ণনীয়, কারণ তারা বাক্যালাপের অতীত এবং বাইরের জগতের চেয়ে অন্তর্জগতের সাথে বেশি সম্পর্কযুক্ত। অন্তরাত্মার গভীরে মরমীবাদী ঋষিরা অবগাহন করেন মনঃসংযোগের বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করে যা সব ধর্মীয় মতবাদেই বিকশিত হয়েছে এবং বীরের পৌরাণিক অভিযানের একটা ভাষ্যে পরিণত হয়েছে। পৌরাণিকতা যেহেতু এই গোপন, গুহ্য প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অনুসন্ধান করে মরমীবাদী ঋষিরা তাই স্বাভাবিক কারণে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে পৌরাণিক আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেন যা প্রথম দর্শনে মনে হবে তাদের সনাতন প্রথার অনুমোদিত ধারার বৈরী। এটা কাবালাহ্, ইহুদিদের মরমী সাধনার ধারায় বিশেষভাবে স্পষ্ট। আমরা দেখেছি বাইবেলীয় লেখকরা ব্যাবিলনীয় আর সিরিয়ান পুরাণের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কাবালীয়রা ঐশ্বরিক বিপ্লবের এমন একটা পদ্ধতির কল্পনা করতো যা *এনুমা এলিশে* বর্ণিত দেবতাদের উৎপত্তির ক্রমিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দুর্বোধ এবং অজ্ঞাত স্বর্গীয় প্রকৃতি (godhead) থেকে, মরমীবাদীরা যাকে বলতেন এন 'সফ' (যার কোনো শেষ নেই), দশ সেফ্রিয়টের উৎপত্তি হয়েছে দশটা প্রবাহ যার দ্বারা এন 'সফ'-এর প্রক্রিয়া বোঝানো হয়েছে, নিজের নিঃসঙ্গ একাকিত্ব থেকে অবতরণ করে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছে।[৯৯] প্রতিটা *সেফিরাহ* ক্রমশ প্রকাশিত এই প্রক্রিয়ার একেকটা মঞ্চ এবং প্রত্যেকের নিজের প্রতীকী নাম রয়েছে। প্রত্যেকে স্বর্গীয় প্রকৃতির রহস্য সীমিত মানব মনে বেশি করে প্রবেশে সাহায্য করে। প্রতিটাই ঈশ্বরের শব্দ এবং একই সাথে অনুষঙ্গ যার দ্বারা ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। শেষ *সেফিরাহ*কে বলা হয় সেকিনাহ্ (shekhinah), পৃথিবীতে ঈশ্বরের দিব্য উপস্থিতি। সেকিনাহ্কে প্রায়শই একজন নারী হিসাবে কল্পনা করা হয়, ঈশ্বরের মানবী প্রকৃতি। কোনো কোনো কাবালীয়রা ঐশ্বরিকতার মানব এবং মানবী অনুষঙ্গের মাঝে যৌন মিলন কল্পনা করে, সম্পূর্ণতা আর পুনরায় অঙ্গীভূতকরণ। কাবালাহ্র কিছু কিছু তরিকায় সেকিনাহ্ পৃথিবীতে একা একা ঘুরে বেড়ায়, বধূ বেশে যে হারিয়ে গেছে এবং স্বর্গীয় প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, দিব্য রাজ্য থেকে নির্বাসিত এবং নিজের উৎসে ফিরতে আকুল। সুমায়ী আইন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, কাবালীয়রা সেকিনাহ্র নির্বাসন শেষ করতে এবং ঈশ্বরের পৃথিবী আবার স্থাপন করতে পারে। বাইবেলীয় সময়ে, আনাট নামে এক ঈশ্বরের স্থানীয় প্রার্থনাকারী দলকে ইহুদিরা ঘৃণা করতো, সে পৃথিবীময় নিজের দিব্য সঙ্গীর খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং শেষে বাআলের সাথে নিজের যৌন পুনর্মিলন উদ্‌যাপন করেছে। কিন্তু ইহুদিরা যখন দিব্য সম্পর্কে নিজেদের মরমী উপলব্ধি প্রকাশ করার একটা পথ খুঁজতে চেষ্টা করে, তখন এই গালাগালির বদলে, পৌত্তলিক পুরাণ ইহুদিদের নিরব সম্মতি লাভ করে।

কাবালাহ্র সম্ভবত কোনো বাইবেলীয় ন্যায্যতা নেই, কিন্তু আধুনিক যুগের আগে সাধারণত এটা ধরে নেয়া হতো যে পুরাণের কোনো "সর্বজন স্বীকৃত" রূপ নেই। নতুন পুরাণ নির্মাণ ব্যাপারে কারো উপরে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না এবং যে কেউ চাইলেই পুরাতন পৌরাণিক ভাষ্যের মৌলিক ব্যাখ্যা করতে পারত। কাবালীয়রা আক্ষরিক অর্থে বাইবেল পাঠ করতো না, তারা একটা ব্যাখ্যা তৈরি করেছিল যা বাইবেলীয় ভাষ্যের প্রতিটা শব্দকে কোনো না কোনো সেফ্রেয়িটে অর্পণ করতো। যেমন সৃষ্টি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিটা শ্লোক একেকটা ঘটনার বর্ণনা করে যার প্রতিটার প্রতি ঘটনা ঈশ্বরের গোপন জীবনে আছে। কাবালীয়রা এমনকি একটা নতুন সৃষ্টি পুরাণও তৈরি করে যার সাথে জেনেসিসের কোনো ধরনের মিল নেই। ১৪৯২ সালে ক্যাথলিক সম্রাট ফার্দিনাণ্ড আর রানী ইসাবেলা স্পেন থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করার পরে, অনেকেই জেনেসিস I এর শান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সৃষ্টি পুরাণের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারতো না, তাই কাবালীয় ইসহাক লুরিয়া (১৫৩৪-৭২) একটা সম্পূর্ণ আলাদা সৃষ্টির গল্প ফাদেন, মিথ্যা সূত্রপাত, দিব্য ভ্রান্তি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকস্মিক বৃদ্ধি, প্রচণ্ড বিপর্যয় এবং বিপর্যয়ের কারণে ক্রাচযুক্ত সৃষ্টির জন্ম হয় যেখানে সবকিছুই ভুল স্থানে রয়েছে। বাইবেলীয় গল্প থেকে ব্যত্যয়ী বিচ্যুতি ইহুদিদের ভিতরে কোনো ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টির বদলে, লুরিয়ানিক কাবালাহ্ একটা ইহুদি গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ষোড়শ শতকে ইহুদিদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা এতে ফুটে উঠেছে কিন্তু পুরাণটা কেবল একটা ভাষ্য না। লুরিয়া এর জন্য বিশেষ আচার অনুষ্ঠান, ধ্যানের পদ্ধতি আর নৈতিক শৃঙ্খলার পরিকল্পনা করেছেন যা পুরাণটির মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে এবং সারা পৃথিবীর ইহুদিদের জীবনে এটা একটা আধ্যাত্মিক বাস্তবতায় পরিণত হয়।

খ্রিস্টান আর মুসলমান ইতিহাসেও অনুরূপ উদাহরণ রয়েছে। পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের যখন পতন হয়, সেন্ট অগাষ্টিন (৩৫৪-৪৩০) উত্তর আফ্রিকার হিপ্পোর বিশপ, আদম আর ঈভের পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা করেন এবং আদিপাপের পুরাণের সৃষ্টি করেন। আদমের অবাধ্যতার কারণে, ঈশ্বর সমগ্র মানব জাতিকে অনন্ত নরকদণ্ড দেন (আরেকটা ধারণা যার কোনো বাইবেলীয় ভিত্তি নেই)। যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে আদমের উত্তরপুরুষদের মাঝে এই পাপ উত্তরাধিকারসূত্রে আরোপিত হতে থাকে, যা 'কামপ্রবৃত্তি' দ্বারা দূষিত, ঈশ্বরের চেয়ে মামুলি প্রাণীর মাঝে আনন্দ আহ্বানের অযৌক্তিক কামনা, প্রথম পাপের স্থায়ী ফল। কামপ্রবৃত্তি যৌনক্রিয়ায় সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়, যখন ঈশ্বরের কথা মনে থাকে না এবং মানুষ নির্লজ্জভাবে একে অন্যের সাথে আনন্দে মাতে। যুক্তির এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুভূতির বিশৃঙ্খলা দ্বারা অধঃপতিত হয়েছে রোমের চাকচিক্যের সাথে যার বিশ্রী রকমের মিল, যা ছিল পশ্চিমের যৌক্তিকতা, আইন আর শৃঙ্খলার উৎস, বর্বর সম্প্রদায়ের হাতে নাজেহাল হয়েছে। আদি পাপের পুরাণকে পশ্চিমা খ্রিস্টানরা তাদের বিশ্বাসের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচনা করে কিন্তু বাইজেনটাইনের গ্রীক অর্থোডক্সেরা, যেখানে রোমের পতন হয়নি, এই মতবাদকে কখন পুরোপরি স্বীকৃতি দেয়নি, তারা বিশ্বাস করে না যে যীশু আদি পাপের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে আদম যদি পাপ নাও করতো ঈশ্বর হয়তো মানুষে পরিণত হতেন।

ইসলামে মরমীবাদীরা বিচ্ছিন্নতার এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার পুরাণ বিকশিত করেছে। তারা বলে যে জেরুজালেমের মসজিদ থেকে হযরত মহম্মদ (স:) আল্লাহ্‌র আরশে এক অতীন্দ্রিয় আরোহণ করেছিলেন। মুসলমান আধ্যাত্মিকতার আদিরূপে পরিণত হয়েছে এই পুরাণ এবং সুফীরা হযরতের নিখুঁত ইসলামী আচরণ বা ঈশ্বরের কাছে 'সমর্পণ'কে প্রতীকীরূপ দিতে এই অতীন্দ্রিয় ভ্রমণের সাহায্য নেয়। শিয়া মুসলমানেরা মহানবীর পুরুষ বংশধরদের ব্যাপারে একটা পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়েছে, যারা তাদের *ইমাম* (নেতা)। প্রত্যেক ইমাম দিব্য *ইলম* এর প্রতিমূর্তি। যখন এই ধারা শেষ হয় তারা বলে যে শেষ ইমাম 'Occultation'-এর পর্যায়ে গিয়েছেন এবং একদিন তিনি ফিরে এসে শান্তি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়বিচারের যুগের সূচনা করবেন। এইখানে, শিয়া মতবাদ প্রাথমিকভাবে মরমী আন্দোলন এবং ধ্যানের বিশেষ পদ্ধতি এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়া এই পুরাণের কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। শিয়ারা নিশ্চিতভাবেই চায় না আক্ষরিক অর্থে তাদের পুরাণের ব্যাখ্যা করতে। ইমামতির এই পুরাণ, মুসলমান গোড়ামিকে যা অবজ্ঞা করে, ঐশ্বরিক উপস্থিতির বোধ প্রকাশে মরমীদের একটা প্রতীকী প্রয়াস, বিপজ্জনক পৃথিবীতে অন্তর্নিহিত এবং গ্রহণযোগ্য। লুক্কায়িত ইমাম একটা মিথে পরিণত হয়েছেন, সাধারণ ইতিহাস থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে তাকে সময় আর স্থানের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এবং আপাতবিরোধী মনে হলেও সত্যি যে এভাবেই তিনি শিয়াদের জীবনে আরো প্রবলভাবে বর্তমান আছেন, আব্বাসীয় খলিফার আদেশে গৃহবন্দি থাকাকালীন সময়ের চাইতে। গল্পটা বিস্মৃতিপ্রবণ হিসাবে ঐশ্বরিকতা সম্বন্ধে আমাদের বোধকে প্রকাশ করে এবং এই পৃথিবীতে লোভনীয়তার রেশ জাগিয়ে অনুপস্থিত কিন্তু এর শেষ নেই।

মিথোস আর *লোগোসের* মাঝে গ্রীকরা ইহুদিদের কিছু অংশ, খ্রিস্টান এবং মুসলমানেরা বিভক্তি অনুভব করার কারণে তাদের সংস্কৃতিতে পৌরাণিকতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সত্ত্বেও এ বিষয়ে অস্বস্তিবোধ করে। অষ্টম আর নবম শতকে প্লাটো আর এরিস্টোটলের লেখা যখন আরবীতে অনূদিত হয় কিছু মুসলমান চেষ্টা করেছিল কোরআনের ধর্মের বদলে একে লোগোসের ধর্মে পরিণত করতে। তারা 'আল্লাহ্'র অস্তিত্বের 'প্রমাণ' বিকশিত করে, এরিস্টোটলের প্রথম কারণ প্রতিপাদনের উপর ভিত্তি করে। তাদের ফালয়াসুফ (faylasuf) বলা হতো, তারা আদিম পৌরাণিক বলে বিবেচিত সবকিছু থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। তাদের কাজটা ছিল কঠিন। কারণ দার্শনিকদের ঈশ্বরের আটপৌরে ঘটনা সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই ইতিহাসে নিজেকে প্রকাশ করেননি, পৃথিবী সৃষ্টি করেননি এবং মানুষের অস্তিত্বের কথাই জানেন না। এসব ছাড়া ফালয়াসুফরা একটা চমকপ্রদ কাজ করেছিল, মুসলিম সাম্রাজ্যে বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে মিলে বাইবেলের ধর্মকে যুক্তিপাতে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। এসব সত্ত্বেও ফালয়াসুফরা সংখ্যালঘু রয়ে যায়, ক্ষুদ্র অভিজাত বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠীতে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। বাইবেলের আর কোরআনের ঈশ্বরের চেয়ে প্রথম কারণ অনেক বেশি যৌক্তিক কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের কাছে এমন দেবতা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া মুশকিল যিনি তাদের প্রতি এত উদাসীন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, গ্রীক অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা এই যৌক্তিক প্রকল্প অপছন্দ করতো। তারা নিজেদের আপন হেলেনীয় প্রথা সম্বন্ধে জানতো এবং আরো ভালো করে জানতো যে, প্লাটো যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তেমন *লোগোস* আর *মিথোস* ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়ন যৌক্তিক অনুশীলন হতে পারে না। কাটা চামচ দিয়ে স্যুপ খাবার মতো অর্থহীন ব্যাপার হবে যুক্তি দিয়ে দিব্যকে নিয়ে আলোচনা করা। বিধিবদ্ধ প্রথা আর প্রার্থনার মাধ্যমে অগ্রসর হলেই কেবল ধর্মতত্ত্বের নির্যাস পাওয়া সম্ভব। মুসলমান এবং ইহুদিরা একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে। একাদশ শতক নাগাদ, মুসলমানেরা সিদ্ধান্ত নেয় দর্শনকে অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার কৃত্যানুষ্ঠান এবং প্রার্থনার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং সুফীদের পৌরাণিক মরমী ধর্ম উনিশ শতক নাগাদ ইসলামে নিয়মাত্মক রূপ লাভ করে। একইভাবে ইহুদিরা আবিষ্কার করে যে, স্পেন থেকে বিতাড়নের মতো বিয়োগাত্মক ঘটনা দ্বারা যখন তারা পীড়িত হয় তাদের দার্শনিকদের যৌক্তিক ধর্ম তাদের কেনো সাহায্যে আসে না এবং তাদের কাবালাহ্‌র পুরাণের দ্বারস্থ হতে হয় যা মনের স্নায়বিক স্তরের মধ্যে চালিত হয়ে তাদের কষ্ট আর আকুতির অন্তর্নিহিত উৎস স্পর্শ করে। পুরাণ আর যুক্তির পুরাতন পরিপূরক দৃষ্টিভঙ্গির শরণ নেয় তারা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গণিত আর চিকিৎসাবিদ্যার মতো ক্ষেত্রে লোগোস অপরিহার্য– মুসলমানদের যাতে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু তারা যখন পরমার্থ এবং তাদের জীবনের মানে খুঁজতে চায়, যখন তারা তাদের হতাশা হ্রাস করতে চেষ্টা করে বা নিজের ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত অঞ্চলের অনুসন্ধান করতে চায়, তারা পুরাণের রাজত্বে প্রবেশ করে।

কিন্তু একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানরা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অন্ধকার যুগে প্লাটো আর এরিস্টটলের হারিয়ে যাওয়া কাজ পুনরাবিষ্কার করে। ঠিক সেই সময়ে যখন ইহুদি আর মুসলমানেরা তাদের পুরাণকে যুক্তিপাতে ফেলার প্রয়াস থেকে সরে আসতে শুরু করেছে, পশ্চিমা খ্রিস্টানরা এই কাজে লাফিয়ে পড়ে এমন একটা উৎসাহ নিয়ে যা তারা কখনও সম্পূর্ণ হারাবে না। পুরাণের অর্থ তারা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। অবাক হবার তাই কিছু থাকে না যখন মানব ইতিহাসের পরবর্তী মহান রূপান্তর শুরু হয়, যা পৌরাণিক আঙ্গিকে চিন্তা করাটা মানুষের জন্য দুরূহ করে তুলবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. পাশ্চাত্যের মহান রূপান্তর
(পনের শতক থেকে বিংশ শতক)

ষোড়শ শতকে ভুল শোধরানো না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা চালিয়ে যাবার পদ্ধতি ব্যবহার করে, ইউরোপের মানুষ এবং পরে, পরবর্তীকালে যা আমেরিকা বলে অভিহিত হবে, সেখানকার মানুষ এমন একটা সভ্যতার নির্মাণ শুরু করে যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই এবং ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী নাগাদ মানচিত্রের অন্যান্য অংশে এই কর্মযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়বে। এটা মানুষের অভিজ্ঞতার শেষ মহান বিবর্তন। কৃষিকাজের উদ্ভব বা নগর পত্তনের মতো, এটারও একটা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, যার ফলাফল আমরা কেবলমাত্র উপভোগ করতে শুরু করেছি। জীবন আর কখনও আগের মতো হবে না, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত– এবং সম্ভাব্য দুর্যোগাকীর্ণ– এই নতুন পরীক্ষার ফলাফল পুরাণের মৃত্যু।

লোগোসের মানসপুত্র পাশ্চাত্য সভ্যতা। একটা ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে এটা প্রতিষ্ঠিত। কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্তের উপরে নির্ভর করার বদলে, যা সব প্রাক-আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, নতুন পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পদের প্রযুক্তিগত পুনরাবৃত্তি আর পুঁজির পূর্ণ বিনিয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন সংস্কৃতির, যার কৃষিভিত্তি অনিবার্য কারণেই ছিল অনিশ্চিত। অনেক বিধিনিষেধ থেকে আধুনিক সমাজকে এটা মুক্তি দিয়েছে। আজকের আগে পর্যন্ত কোনো আবিষ্কার বা ধারণা যা বাস্তবায়ন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন সমূহ সম্ভাবনা ছিল তা স্থগিত রাখার কারণ আমাদের আগে কোনো সমাজই আজ যা আমরা সম্ভব বলে প্রথমেই ধরে নেই, সেই বিরামহীনভাবে কাঠামোর পুনরাবৃত্তির হ্যাপা সামলাতে পারতো না। জমির উর্বরতা আর ফসলের ফলনের জন্য নানা প্রভাবকের উপর নির্ভর করতে হতো বলে কৃষিজীবী সমাজ ছিল ঘাতোপযোগী। সাম্রাজ্য কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে নিজের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতো এবং অনিবার্যভাবে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি নিঃশেষ করে ফেলতো। কিন্তু পশ্চিমে এমন একটা অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে আপাতদৃষ্টিতে যা অনন্তকালব্যাপী পুনর্নবায়নের সম্ভাবনাযুক্ত। অতীতের দিকে তাকিয়ে যা অর্জিত হয়েছে তা রক্ষা করা, যা ছিল প্রাক-আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, এই মনোভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিত্যাগ করে পশ্চিমের মানুষ সামনের দিকে তাকাতে শুরু করেছে। আধুনিকায়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়া : যা সম্পন্ন করতে ইউরোপের প্রায় তিন শতাব্দী প্রয়োজন হয়েছে, ব্যাপক পরিবর্তনের একটা ধারাবাহিক সমাবেশ : শিল্পায়ন, কৃষির রূপান্তর, নতুন শর্ত পূরণ সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের স্বীকৃতি, এবং একটা বুদ্ধিবৃত্তিক 'বিকাশ' যা মিথ্যা, অদরকারী আর বাতিল, অচল বলে পুরাণের মানহানি ঘটিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক, প্রয়োগকারী সত্তার উপর নির্ভর করেই এসেছে পশ্চিমাদের অর্জন। দক্ষতা আজ নতুন মন্ত্রশব্দ। সবকিছুকে কাজ করতে হবে। একটা নতুন আবিষ্কার বা ধারণার যুক্তিপাতের সামর্থ্য থাকতে হবে এবং দেখতে হবে সেটা বহির্জগতের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। পুরাণের মতো নয়, লোগোসকে অবশ্যই ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; এটা মূলত প্রায়োগিক, আমরা যখন কিছু করতে চাই তখন চিন্তার এই পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করি; আমাদের পরিবেশের উপর আরো অধিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বা নতুন কিছু আবিষ্কারের তাগিদে এটা সবসময় সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পশ্চিমা সমাজের নতুন নায়ক তাই এখন থেকে বিজ্ঞানী বা উদ্ভাবক যিনি তার সমাজের জন্য অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। তাকে প্রায়ই পুরাতন পবিত্র অনুভূতি ছুঁড়ে ফেলতে হয়– যুগান্তকারী পর্বের ঋষিরা যেমনটি করেছিলেন। পশ্চিমা আধুনিকতার এই নায়করা কিন্তু লোগোসের প্রযুক্তিগত বা বৈজ্ঞানিক প্রতিভা মিথোস দ্বারা অনুপ্রাণিত আধ্যাত্মিক প্রতিভা নন। তার মানে দাঁড়ায় যে ভাবনার অন্তর্জ্ঞানলব্ধ পৌরাণিক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতার প্রায়োগিক যুক্তিবাদী সত্তার কাছে অবহেলিত হবে। কারণ পাশ্চাত্যের অধিকাংশ লোকই পুরাণ ব্যবহার করে না, এটা কি সে জানেও অনেক খুইয়ে বসেছে।

পশ্চিমে আজ নতুন আশাবাদী মানুষ অনুভব করে যে প্রকৃতির উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ বেশি। পবিত্র, অপরিবর্তনীয় আইন বলে আর কিছু নেই। বেঁচে থাক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ তারা প্রকৃতিকে পরিচালিত করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। আধুনিক ঔষুধের আবিষ্কার স্বাস্থ্যবিধি, শ্রমিকের উপরে নির্ভরতা কমিয়ে আনা প্রযুক্তি আর উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা পশ্চিমা মানুষের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কিন্তু লোগোস মানুষকে কখনও গুরুত্বের সেই বোধটা দিতে পারবে না যেটার প্রয়োজন তাদের আছে। জীবনকে মানে দিয়েছে আর ছাঁচে ফেলেছে পুরাণ। কিন্তু আধুনিকতার অগ্রসর হবার সাথে এবং লোগোসের চমকপ্রদ অর্জনের ফলে পৌরাণিক তত্ত্বের সুনাম ক্রমেই খর্ব হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ, আমরা, অসাড় হতাশার আরো নজির, ক্রমবর্ধমান মানসিক জড়তা এবং একটা অক্ষমতাবোধ আর তদজনিত ক্ষোভ, পুরাতন পৌরাণিক চিন্তাধারা ভেঙে পড়লে এবং তার স্থানে নতুন কিছুর আবির্ভাব না হলে, লক্ষ্য করি। উন্নতশীল দেশগুলোতে একই ধরনের সামাজিক মূল্যবোধহীনতাজনিত পরিস্থিতি লক্ষ্য করি যারা আধুনিকায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এখনও রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোড়শ শতকে, সংস্কারকদের মাঝে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যারা ইউরোপের ধর্মকে আরো পরিশীলিত পরিমার্জিত এবং আধুনিক করার প্রয়াস নিয়েছেন। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৩৬) যন্ত্রণাদায়ক হতাশা আর ক্রোধের আকস্মিক বহিঃপ্রকাশের শিকার হয়েছেন। উলরিখ জিংলী (১৪৮৪-১৫৩১), এবং জন ক্যালভিন (১৫০৯-৬৪) লুথারের বিবশ করা অসহায়ত্ব তারাও মানুষের অস্তিত্বের পরীক্ষার সামনে অনুভব করতেন– একটা ব্যাধি যা তাদের সমাধান খুঁজতে বাধ্য করেছে। তাদের পরিমার্জিত খ্রিস্টানধর্ম দেখায় যে বিকাশমান আধুনিক সত্তা পৌরাণিক চেতনাবোধ থেকে কতটা বিপরীত। প্রাক আধুনিক ধর্মে, সাদৃশতাকে পরিচয় হিসাবে দেখা হতো, তাই প্রতীক ছিল যে বাস্তবতা উপস্থাপন করে তার সাথে সম্পর্কিত। এখন, সংস্কারকদের মতামত অনুসারে, ইউক্যাবিষ্টের মতো কোনো কৃত্য 'কেবল' একটা প্রতীক– যা অপরিহার্যভাবে আলাদা। কোনো প্রাক আধুনিক কৃত্যর ন্যায়, খ্রিস্টের বলিসদৃশ মৃত্যু খ্রিস্টের নৈশভোজের পর্ব উদ্‌যাপনে পুনরায় বিধিবদ্ধ হয়েছে, যা পৌরাণিক হবার কারণে সময়নিরপেক্ষ এবং একে বর্তমান বাস্তবতায় পরিণত করেছে। সংস্কারকদের কাছে, এটা কেবল বিগত দিনের অনুষ্ঠানের একটা স্মারক মাত্র। বাইবেল সম্বন্ধে নতুন গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু ছাপাখানার আবিষ্কার এবং শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পবিত্র ভাষ্যের ব্যাপারে মানুষের ধারণা দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। নিরব নিভৃত পাঠের স্থান নিয়েছে গণ-প্রার্থনা। মানুষ এখন অনেক বিশদভাবে বাইবেলকে জানতে পারে এবং তাদের নিজস্ব ধারণা থেকে, কিন্তু এখন আর একে ধর্মীয় আচারের অংশ হিসাবে পাঠ করা হয় না, অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থের ন্যায়, বস্তুনিষ্ঠ উপাত্তের জন্য লোকায়ত ভঙ্গিতে সহজেই এটার পাঠ করা সম্ভব।

জীবনের প্রায় সব জিনিসের ন্যায়, অনেক আধুনিক আবিষ্কারও ঝামেলা সৃষ্টিকারী। নতুন জ্যোতির্বিদ্যা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মুগ্ধ করা দৃশ্য অবারিত করেছে। নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) তার নতুন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন যা তার মাঝে ভয় আর শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্মানবোধের উদ্রেক ঘটিয়েছিল। কিন্তু তার প্রাপ্ত ফলাফল ছিল বিভ্রান্তকারী। পুরাণ মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল যে বিশ্বের নির্যাসের সাথে তারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত কিন্তু এখন এটা প্রতীয়মান হয় যে একটা ক্ষুদ্র নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্বতন্ত্রতাহীন গ্রহে কেবল প্রান্তিক অবস্থান তাদের রয়েছে। তারা আর নিজেদের উপলব্ধিকে বিশ্বাস করতে পারে না, কারণ আপাত স্থির পৃথিবী আসলে প্রবল গতিশীল। নিজেদের নিজস্ব ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে তারা ক্রমশ উৎসাহী হয়ে উঠে কিন্তু তারা আরও বেশি বেশি করে আধুনিক 'বিশেষজ্ঞ'দের অধীন হয়ে পড়ে, যারাই কেবল বস্তুর প্রকৃতির গোপনীয়তা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম।

বৃটেনে, ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) স্বাধীনতার একটা ঘোষণা দেন, বিজ্ঞানকে পুরাণের বন্ধন থেকে স্বাধীন করতে। Advancement of Learning-এ (১৬০৫) তিনি একটি নতুন গৌরবময় যুগের ঘোষণা করেন। মানুষের দুর্দশা বিনাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বিজ্ঞান পৃথিবীকে রক্ষা করবে। কোনো কিছুই এই পরিবর্তনের গতি রোধ করতে পারবে না। সব ধর্মীয় পুরাণকে কঠোর সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করতে হবে এবং তারা যদি প্রমাণিত ঘটনার বিরোধিতা করে তবে তাদের একপাশে বাতিল বলে সরিয়ে রাখতে হবে। এই সত্যের সন্ধান কেবলমাত্র যুক্তি দিতে পারে। স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) সম্ভবত প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এই প্রায়োগিক মূল্যবোধ পুরোপুরি আত্মস্থ করেছিলেন, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের বিকাশমান বৈজ্ঞানিক ধারা কঠোরভাবে ব্যবহার করে তিনি তার পূর্ববর্তীদের প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তিনি মানুষের জন্য পৃথিবী সম্বন্ধে নজীরবিহীন এবং নির্দিষ্ট তথ্য হাজির করছেন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন তা পুরোপুরি প্রকৃত ঘটনার সাথে মিলে যায় এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, মহান 'মেকানিক' যিনি দুর্বোধ্য বিশ্ব ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু *লোগোস* এই সম্পূর্ণ অবগাহন উপলব্ধির অন্তর্জ্ঞানের রূপ আরো বেশি মূল্যায়ন করা নিউটনের জন্য অসম্ভব করে তোলে। তার কাছে পৌরাণিক তত্ত্ব আর মরমীবাদ ছিল চিন্তাধারার আদিম পদ্ধতি। তিনি অনুভব করেন খ্রিস্টান ধর্মকে ট্রিনিটির মতো মতবাদ থেকে মুক্ত করা তার কর্তব্য, যা যুক্তির নীতিসমূহ অমান্য করে। তিনি এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে চতুর্থ শতকের গ্রীক ধর্মবেত্তার দল এই মতবাদ কেবল একটা পুরাণ হিসাবে কল্পনা করেছিলেন, যা অনেকটা ইহুদি কাবালিষ্টদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নিসসার বিশপ (৩৩৫-৩৯৫) গ্রেগরী যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, পিতাপুত্র আর পবিত্র সত্তা, মোটেই অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ক বাস্তবতা না কিন্তু আমরা এই পদগুলো ব্যবহার করি, আমাদের মানবমনের সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে 'নামহীন অব্যক্ত' দিব্যসত্তা কিভাবে নিজেকে অভিযোজিত করে, সেটা প্রকাশ করতে।[১০০] যুক্তিপাতের দ্বারা আমরা ট্রিনিটির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারব না। কবিতা বা সঙ্গীতে বিস্মৃতিপ্রবণ অর্থের চেয়ে বেশি কিছু এটা দ্বারা বোঝানো হয় না। কিন্তু নিউটন কেবল যৌক্তিকভাবেই ট্রিনিটির নিকটবর্তী হতে পারতেন। কোনো কিছু যদি যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে সেটা মিথ্যা। 'ধর্মের ক্ষেত্রে মানব জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশের আর উগ্রতার মাত্রা এটা,' তিনি বিরক্ত হয়ে লেখেন, 'সবসময়েই রহস্যের ভক্ত আর সে কারণে যেটা সবচেয়ে কম বোঝে সেটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে'।[১০১] বর্তমানের কসমোলজিষ্টরা নিউটনের যৌক্তিক ঈশ্বরে আর বিশ্বাস রাখেন না কিন্তু পশ্চিমের অনেক লোকই তার যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া আর পুরাণ সম্বন্ধে অস্বস্তিবোধে ভোগে এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও। নিউটনের মতো, তারাও মনে করে যে ঈশ্বরের প্রকাশযোগ্য আর বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা থাকা উচিত। যাই হোক বহুসংখ্যক পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ট্রিনিটিকে নিয়ে প্রায়ই সমস্যায় পড়ে। নিউটনের মতো তারাও অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে ট্রিনিটি সম্বন্ধীয় পুরাণের সৃষ্টি হয়েছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের এটা স্মরণ করিয়ে দিতে যে তারা যেন দৈবকে ব্যক্তিত্বের মামুলি আঙ্গিকে চিন্তা করার চেষ্টা না করে।[১০২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈজ্ঞানিক *লোগোস* আর পুরাণ ক্রমশ পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠছে। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান পুরাণের বিভিন্ন অংশের মাঝে পরিচালিত হয়েছে যা এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে। ফরাসী গণিতবিদ ব্লেইসী প্যাসকেল (১৬২৩-৬২) ছিলেন পরম ধার্মিক একজন মানুষ, যখন তিনি অনন্ত বিশ্বের 'চিরন্তন নিরবতা, আধুনিক বিজ্ঞান যা উন্মুক্ত করেছে, বিবেচনা করেন তার মন আতঙ্কিত হয়ে উঠে।

> মানুষের অন্ধ দুর্দশাময় অবস্থা আমি যখন দেখি, সমগ্র বিশ্বকে আমি যখন এর নিরবতার মাঝে পর্যবেক্ষণ করি, এবং আলো ছাড়া মানুষ একাকী পড়ে রয়েছে যেন বিশ্বের এই কোণে সে হারিয়ে গেছে জানেও না কে তাকে এখানে স্থাপন করেছে, কি তার করণীয়, বা মারা গেলে তার কি হবে, কোনো কিছু জানতে অক্ষম, আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি, সেই মানুষের মতো ঘুমের মাঝে যাকে কোনো ভয়ংকর নিঃসঙ্গ দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, পালাবার পথ বিচ্ছিন্ন এই একটা অনুভূতি নিয়ে যে জেগে উঠেছে। তারপরে আমি বিস্মিত হই, এত দুর্দশাপূর্ণ অবস্থাতেও মানুষকে হতাশ না হতে দেখে।[১০৩]

এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক অভিজ্ঞতারও অংশ।

অষ্টাদশ শতকের যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশের কালে এই মেঘ কিছুটা দূর হয়েছিল বলে মনে হয়। জন লক (১৬৩২-১৭০৪) অনুধাবন করেন যে দিব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না, এবং বিশ্বাস করতেন মানবতা একটা গঠনমূলক যুগে প্রবেশ করেছে। আলোকপ্রাপ্ত ফরাসী আর জার্মান দার্শনিকের দল পুরাতন অরমীবাদ আর পৌরাণিক ধর্মকে বাতিল হিসাবে দেখতেন। বৃটিশ ধর্মবেত্তা জন টোল্যান্ড (১৬৭০-১৭২২) আর ম্যাথিউ টিনডালও (১৬৫৫-১৭৩৩) একই মত পোষণ করতেন। সত্যের সন্ধান কেবল *লোগোস* দিতে পারে এবং মরমীতত্ত্ব আর পৌরাণিকতার নিগড় থেকে খ্রিস্টান ধর্মকে মুক্ত হতে হবে। পুরাতন পুরাণগুলোকে, সেগুলো যেন *লোগোই* (Logoi)এভাবে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়, একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারা ব্যর্থতা তার নিয়তি, কারণ এসব গল্প কখনও বস্তুনিষ্ঠ ছিল না।

যদিও, স্ববিরোধী হলেও, Age of Reason অযৌক্তিকতার উৎপাত প্রত্যক্ষ করে। ষোড়শ আর সপ্তদশ শতকের ব্যাপক ডাইনী ভীতি যা ইউরোপের ক্যাথলিক আর প্রোটেষ্ট্যান্ট অনেক দেশকে ছারখার করে দিয়েছে, প্রমাণ করেছে যে মনের অশুভ শক্তিগুলোকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপাত দমিয়ে রাখতে অপারগ। ডাইনী ভীতি ছিল একটা সমন্বিত অশুভ কল্পনার ফসল যা হাজার হাজার নারী ও পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড আর নির্যাতন নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। মানুষ তখন বিশ্বাস করত ডাইনীদের শয়তানের সাথে যৌন সম্পর্ক রয়েছে এবং বাতাসে ভেসে শয়তানের বন্য আনন্দোৎসবে তারা যোগ দিতে যায়। মানুষের অবচেতন মনের ভয় ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো শক্তিশালী পুরাণের অনুপস্থিতির কারণে তারা তাদের ভয়কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তির মোড়কে সিদ্ধ করতে চেয়েছে। ভীতিকর আর বিধ্বংসী কু-যুক্তি সবসময়ে মানুষের অভিজ্ঞতার অংশ হিসাবে বিরাজ করেছে এবং এখনও করছে। নতুন খ্রিস্টান আন্দোলনে খুব জোরালোভাবে এর উন্মেষ ঘটেছে যা আলোকিত যুগের ধারণাসমূহকে ধর্মীয় আঙ্গিকে ভাষান্তরের চেষ্টা করেছে। বন্ধুসভার সদস্যদের (Quaker) এই বিশেষ নামে ডাকা হয় কারণ তাদের সমাবেশের সময়ে তারা শিহরিত হয়, নেকড়ের মতো হুঙ্কার করে আর তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠে। পিউরিটানদের অনেকে সফল পুঁজিপতি এবং খ্যাতিমান বিজ্ঞানী হলেও অব্যবস্থিত আধ্যাত্মিকতা এবং স্নায়বিক রূপান্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন অনেকেরই তা সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। ব্যাপকসংখ্যক হতাশার শিকার হন এবং কেউ কেউ এমনকি আত্মহত্যাও করে।[১০৪] নিউ ইংল্যাণ্ডের (১৭৩৪-৪০) প্রথম মহান জাগরণের সময়ও একই লক্ষণ আবার দেখা যায়। সকলেই মরমীবাদে দক্ষতা লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু মরমীবাদের উচ্চতর মার্গ সকলের জন্য না। বিশেষ প্রতিভা, মানসিকতা আর গুরু শিষ্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এর জন্য। অদক্ষ লোকের সমন্বয়ে গঠিত দলের অভিজ্ঞতা গণ উন্মত্ততা এমনকি মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে।

উনিশ শতক নাগাদ, ইউরোপের মানুষ ধর্মকে ক্ষতিকর হিসাবে ভাবতে শুরু করে। লুডউইগ ফয়েরবাখ (১৮০৪-৭২) যুক্তি উপস্থাপন করেন যে এটা মানুষকে মানবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) ধর্মকে অসুস্থ সমাজের উপসর্গ হিসাবে বিবেচনা করেন। আর সত্যিই সেই সময়ের পৌরাণিক ধর্ম একটা অস্বাস্থ্যকর বিরোধ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখতো। এটা ছিল বিজ্ঞানের যুগ এবং মানুষ বিশ্বাস করতে চাইতো যে তাদের সনাতন আচার অনুষ্ঠান নুতন যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু পুরাণগুলোকে সাহিত্যের আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে সেটা অসম্ভব একটা প্রকল্পে পরিণত হয়। চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) The Origin of Species (১৮৫৮) প্রকাশ করলে উন্মাদনায় যেন ঢাকের বোল পড়ে। ধর্মকে আঘাত করার কোনো উদ্দেশ্য বইটার ছিল না, এটা ছিল, বৈজ্ঞানিক উপপ্রমেয়র একটা সংযমী অনুসন্ধান। কিন্তু সে সময়ে মানুষ সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন তত্ত্ব এমন ভঙ্গিতে পাঠ করতো যেন সেটা প্রকৃত ঘটনা, অনেক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অনুভব করেন– এবং আজও অনুভব করেন যে বিশ্বাসের সৌধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সৃষ্টির গল্পগুলোকে কখনও ঐতিহাসিকভাবে নির্ভুল বিবেচনা করা হয়নি; উপশম আনয়নকারী হিসাবেই এগুলোকে দেখা হতো। কিন্তু কেউ যদি সৃষ্টিতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্ভুল মনে করে পাঠ শুরু করে তাহলে সেটা হবে অপবিজ্ঞান আর অধর্মের নামান্তর।

নতুন Higher Criticism, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মসংক্রান্ত বিজ্ঞানের পদ্ধতি স্বয়ং বাইবেলের উপর আরোপ করে দেখিয়েছে যে অক্ষরে অক্ষরে বাইবেল পাঠ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। এর কিছু কিছু দাবী প্রত্যক্ষ প্রমাণজনিত কারণে অসত্য। Pentateuch মোটেই মূসা (আ:) রচনা করেন নাই, অনেক পরে একাধিক লেখকের দ্বারা এটা লিখিত; স্তুতিগানগুলো কিং ডেভিডের রচনা না; অলৌকিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পগুলোর বেশির ভাগই সাহিত্যের আলঙ্কারিক প্রয়োগ। বাইবেলীয় ভাষ্যগুলো 'পুরাণ' এবং প্রচলিত বাচনভঙ্গিতে রচিত যার মানে সেগুলো সত্য না। প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা Higher Criticism-কে এখনও জুজুর মতো ভয় করে, তারা দাবী করে যে বাইবেলের প্রতিটা অক্ষর সাহিত্যের দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর ঐতিহাসিকভাবে সত্য– সমর্থনের অযোগ্য একটা অবস্থান যা ব্যপনয়ন / অপহ্নব আর রক্ষণাত্মক তর্কের সূচনা করে।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ, *লোগোস* আর *মিথোসের* মাঝে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। টমাস এইচ. হাক্সলির (১৮২৫-৯৫) মতো ধর্মযোদ্ধারা বিশ্বাস করতেন এটা তাদেরই দায়িত্ব। পুরাণ আর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের মধ্যে থেকে একটা বেছে নিতে হবে এবং এতে কোনো আপোস চলবে না। যুক্তিই কেবল সত্যি আর ধর্মীয় পুরাণ সত্যরহিত। কিন্তু সত্যের মানে এখন 'প্রদর্শিত আর প্রদর্শনযোগ্য'[১০৫] এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, ধর্মকে পাশে রেখে, যা সঙ্গীত আর চিত্রকলা দ্বারা কথিত সত্যকে বর্জন করবে। পুরাণকে যৌক্তিক ভেবে নিয়ে, আধুনিক বিজ্ঞানী আর দার্শনিকের দল একে অবিশ্বাস্য করে তুলেছেন। ১৮৮২ সালে, ফ্রেডারিক নিট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০) ঘোষণা করেন যে ঈশ্বর মৃত। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তার কথাই ঠিক। পুরাণ, কৃত্যানুষ্ঠান, প্রার্থনার প্রথা, নৈতিক জীবনযাপন ব্যতীত, দিব্যচেতনা মারা যাবে। 'ঈশ্বর'কে পুরোপুরি নিদর্শনমূলক সত্যে পরিণত করে, যা কেবল সমালোচনামূলক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বোঝা যায়, আধুনিক নারী ও পুরুষ তাদের জন্য একে হত্যা করেছে। নিটশের রূপক কাহিনী The Gay Science-এর পাগল লোকটা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের মৃত্যুতে মানবতা তার মূল থেকে বিচ্যুত হয়েছে। 'উপর বা নিচ বলে কিছু কি এখনও আছে?' সে জানতে চায়। 'অনন্ত অসারতার মধ্যে দিয়ে আমরা কি পথভ্রষ্ট হইনি?'[১০৬]

পৌরাণিক চিন্তা আর আচরণ মানুষকে অসারতা আর বিলুপ্তির সম্ভাবনা মোকাবেলা করতে সাহায্য করতো এবং এর মধ্যে দিয়ে একটা পর্যায় পর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হতো। এই ধারাটা ছাড়া অনেকের পক্ষেই হতাশার থাবা এড়ানো অসম্ভব ছিল। বিংশ শতাব্দী আমাদের একের পর এক নাস্তিবাদী স্মারক উপহার দিয়েছে এবং আধুনিকতার অনেক অসংযত আশা মিথ্যা হিসাব প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১২ সালে *টাইটানিকের* সলিল সমাধি হওয়াটা প্রযুক্তির নশ্বরতা আমাদের সামনে তুলে ধরে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, আমাদের বন্ধু, বিজ্ঞানকে, আয়ুধের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিয়োগ করা সম্ভব, অসউইচ, গুলাগ আর বসনিয়ায় আমরা দেখি ঐশ্বরিকতার সব বোধ নষ্ট হলে কি ঘটতে পারে। আমরা জেনেছি যে যৌক্তিক শিক্ষা মানবতাকে বর্বরতা থেকে মুক্তি দেবে না, এবং বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অস্তিত্ব নাকচ করা যাবে না। হিরোশিমা নাগাসাকির উপরে প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ আধুনিক সংস্কৃতির মূলে আত্মনাশী নাস্তিবাদী জীবাণু উন্মোচিত করেছে; ২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা দেখিয়েছে যে আধুনিকতার সুবিধাসমূহ– প্রযুক্তি, অনায়াস ভ্রমণ আর বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা– আতঙ্কের অনুষঙ্গে পরিণত হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোগোস অনেকভাবে আমাদের জীবন পরিবর্তিত করে তাকে উন্নত করেছে, কিন্তু এটা কোনো নিরঙ্কুশ অর্জন না। আমাদের পৌরাণিকতারহিত পৃথিবী আমাদের অনেকের জন্য আরামপ্রদ, আমরা যারা প্রথম বিশ্বে বাস করার মতো ভাগ্যবান কিন্তু বেকন আর লক যে পার্থিব স্বর্গের কল্পনা করেছিলেন সেটা আর যাই হোক এটা না। আমরা বিংশ শতাব্দীর নানা অশুভ আগমন বার্তা যখন বিবেচনা করি, তখন দেখি যে আধুনিক দুশ্চিন্তা কেবল আত্মপ্রশ্রয়ী খেপাটে স্বভাবের মামুলি ফলাফল না। নজিরবিহীন কিছু একটার প্রথমবারের মতো আমরা মুখোমুখি হয়েছি। অন্যান্য সমাজে মৃত্যুকে অস্তিত্বের একটা ধরন থেকে অন্য একটা ধরনে রূপান্তর হিসাবে দেখা হয়। পরকাল সম্বন্ধে কোনো ধরনের অবিমিশ্র, স্থূল ধারণা তারা লালন করে না, কিন্তু পরিকল্পিত কৃত্য আর পুরাণ মানুষকে অবর্ণনীয়ের মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। অন্য কোনো সংস্কৃতিতে কেউ অতিক্রমণের বা দীক্ষাদানের মাঝপথে আতঙ্কের শেষ না দেখে থামবে না। কিন্তু টেকসই পুরাণের অনুপস্থিতিতে আমরা ঠিক সেটাই করছি। পুরাণের বর্তমান বর্জনের মাঝে একটা মর্মস্পর্শী ও বীরোচিত সন্ন্যাস রয়েছে। কিন্তু একেবারে যৌক্তিক, রৈখিক আর ঐতিহাসিক চিন্তার ধরন আমাদের অনেককেই উপশম আর মাধ্যমের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করছে যা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে তাদের মানবতার পূর্ণ সম্পদের উপর নির্ভর করে অগ্রহণযোগ্যতার সাথে বাস করতে সাহায্য করে।

আমরা হয়তো বৈষয়িক দিকে অনেক বেশি পরিশীলিত হয়েছি, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে আমরা এখনও অ্যাক্সিয়াল যুগের ঊর্ধ্বে যেতে পারিনি : *মিথোসের* অবদমনের ফলে হয়তো আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। আমাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতের 'ঊর্ধ্বে' উঠতে এবং 'পুরোপুরি' আরও প্রবল, পরিপূর্ণ অস্তিত্বে প্রবেশ করতে দেরি আছে। চিত্রকলা, মাদকদ্রব্য, রক সঙ্গীত বা চলচ্চিত্রের জীবনের চেয়ে বড় দৃষ্টরূপে প্রবেশ করে আমরা এই মাত্রায় বিলীন হতে চাই। আমরা আজও বীরের পূজারী। প্রিন্সেস ডায়ানা আর এলভিস প্রিসলী তাই সাথে সাথে পৌরাণিক সত্তায় পরিণত হয় এমনকি ধর্মীয় প্রার্থনাসভার কাল্টের বিষয়ে পরিণত হয়। বীরের পুরাণ আমাদের শ্রদ্ধার স্মারক সরবরাহ করবে সেটা অভিপ্রেত না কিন্তু বীরত্বের শোণিত ধারা আমাদের মাঝে সঞ্চারিত করবে সে লক্ষ্যে পরিকল্পিত। অপ্রতিরোধী বিবেচনা না অংশগ্রহণ বা সীমিতকরণের দিকে পুরাণকে অবশ্যই পথ দেখাতে হবে। আমরা আজ জানি না কিভাবে আমাদের পৌরাণিক জীবনকে বশে আনতে পারি এমনভাবে যা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং রূপান্তরযোগ্য।

পুরাণ মিথ্যা বা চিন্তাধারার নিকৃষ্টতম ধরনের উপস্থাপক ঊনবিংশ শতকের ভ্রান্তির এই মায়াজাল থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। আমরা আমাদের পুরোপুরি পুনর্গঠন করতে পারব না, আমাদের শিক্ষার যৌক্তিক দুর্বলতা নাকচ করে প্রাক আধুনিক সুকুমার আবেগ, সংবেদনশীলতায় ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে আর সম্ভব না। কিন্তু পৌরাণিক তত্ত্বের প্রতি আমরা অনেক পরিশীলিত মনোভাব অর্জন করতে পারি। আমরা পুরাণ সৃষ্টিকারী প্রাণী এবং বিংশ শতাব্দী জুড়ে আমরা কিছু অতীব ধ্বংসাত্মক আধুনিক পুরাণ দেখেছি, যার শেষ হয়েছে রক্তপাত আর গণহত্যার ভিতর দিয়ে। অ্যাক্সিয়াল যুগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশিষ্ট্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এসব পুরাণ ব্যর্থ হয়েছে। সহানুভূতিশীলতা, সব জীবনই মূল্যবান বা কনফুসিয়াস যাকে বলেছিলেন 'Leaning' তার প্রতি কোনো প্রকার ভক্তি এসব গুণাবলী আধুনিক পুরাণে সঞ্চারিত করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এসব ধ্বংসাত্মক পুরাণ সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের বিভক্তি দ্বারা অভিযুক্ত আর অন্যদের আসুরিকভাবে দমন করে নিজের আত্মপ্রচারের একটা স্বার্থপর প্রচেষ্টা। এমনসব পুরাণের কারণেই আধুনিকতা ব্যর্থ হয়েছে, যা একটা বিশ্ব বসতি তৈরি করেছে যেখানে প্রতিটা মানুষ আজ নিজেদের একই ধরনের বিপাকে দেখতে পাচ্ছে। কেবল যুক্তির দ্বারা এসব পুরাণকে পরাস্ত করা সম্ভব না কারণ এ ধরনের সুদূরপ্রসারিত, মন্ত্রপূত ভয়, আকাঙ্ক্ষা এবং স্নায়বিক বৈকল্যকে কেবলমাত্র আনাড়ি *লোগোসের* দ্বারা দূর করা সম্ভব না। আধ্যাত্মিক আর নৈতিকভাবে পুষ্ট পুরাণের কাজ সেটা।

আজ আমাদের এমন পুরাণ প্রয়োজন যা অন্য সব মানুষের সাথে নিজেদের চিহ্নিত করতে আমাদের সহায়তা করবে, যারা আমাদের জাতীয়, আদর্শগত বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না। করুণার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে এমন পুরাণ আজ আমাদের প্রয়োজন যাকে আমাদের যৌক্তিক প্রয়োগবাদী পৃথিবীতে দক্ষ বা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনশীল হিসাবে গণ্য করা হয় না। আমাদের আশু প্রয়োজনকে ছাপিয়ে দেখতে সাহায্য করে এমন আধ্যাত্মিক মনোভাব গড়ে তুলবে আমাদের আজ সেই পুরাণ দরকার এবং আমাদের পরিশীলিত স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রশ্নের আঙ্গুল তুলবে যা আমাদের একটা সর্বব্যাপী বোধ অনুভবে সাহায্য করবে। কেবল তার 'সম্পদ' ব্যবহার না করে, পৃথিবীকে ঐশ্বরিক হিসাবে আমাদের আরো একবার সম্মান করতে শেখাবে, এমন পুরাণ আজ প্রয়োজন। এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক বিপ্লব, যা আমাদের প্রযুক্তিগত প্রতিভার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম, না হলে, আমরা আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতে পারব না।

১৯২২ সালে, টি.এস. এলিয়ট তার বিখ্যাত কবিতা The Waste Land-এ পশ্চিমা সংস্কৃতির এই আধ্যাত্মিক বিখণ্ডায়ন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। Holy Grail-এর পুরাণে, ওয়েস্টল্যাণ্ডের লোকেরা কৃত্রিম জীবনযাপন করে, কোনোপ্রকার বিশ্বাস ছাড়া অন্ধভাবে সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে গভীর অনুকম্পা থেকে যার উৎপত্তি। নিজের সংস্কৃতির পৌরাণিক ভিত্তির পরশ যেখানে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে সেখানে কি আধুনিকতার 'পাথুরে জঞ্জালে' সৃষ্টিশীলতার মূল প্রোথিত করা সম্ভব? নিজেদের রীতিনীতির অন্তর্নিহিত প্রাঞ্জলতা অনুধাবনের পরিবর্তে তারা জানে কেবল 'ভাঙ্গা প্রতিমার এক ঢেলা'। অতীতের পুরাণের মর্মভেদী যথাযথ উল্লেখের সাহায্যে– ইউরোপীয়, সংস্কৃত, বৌদ্ধ, বাইবেলীয়, গ্রীক আর রোমান পুরাণ– আধুনিক জীবনের বন্ধ্যাত্বকে প্রকাশ করেন এলিয়ট; এর বিচ্ছিন্নতাবোধ, অবসাদ, বিষণ্নতা, নাস্তিবাদী, কুসংস্কার, হতাশা আর আত্মপ্রচার। পশ্চিমা সভ্যতার আশু বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তার কথক উপসংহার টানে : 'আমার ধ্বংসের মাঝে এসব টুকরো আমি বিলিয়ে দিলাম।' অতীতের অন্তর্দৃষ্টির এই খণ্ডিতাংশ যা এই কবিতায় তিনি একত্রিত করেছেন আমাদের বাঁচিয়ে দিতে পারে। এই টুকরোগুলোকে একত্রিত করে আমরা তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ নির্যাসটুকু যদি অনুধাবন করতে পারি, আমরা আমাদের ওয়েস্টল্যাণ্ড যেখানে আমরা বাস করতাম পুনরুদ্ধার করতে পারব।

ইলিয়টের কবিতাটা ছিল ভাবীসূচক। ধর্মীয় নেতাদের চাইতে লেখক আর শিল্পীর দলই শূন্যতায় অবগাহন করে আমাদের অতীতের পৌরাণিক প্রজ্ঞার সাথে পুনরায় পরিচয় করাতে চেষ্টা করেছে। তাদের আধুনিকতার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা আর বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক খুঁজে পাবার প্রচেষ্টায় অনেকেই যেমন চিত্রশিল্পীদের কথাই ধরা যাক, পৌরাণিক ভাবধারায় মনোনিবেশ করেছেন। ১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল, স্পেনের গৃহযুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করেছে, নাজী যুদ্ধবিমান, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরাসরি নির্দেশে বাসক রাজধানী গুয়েরনিকায় হাটবারে আক্রমণ করে, এর ৭০০০ অধিবাসীর ১৬৫৪ জনকে হত্যা করে। কয়েক মাস পরে, প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পাবলো পিকাসো তার *গুয়েরনিকা* চিত্রকর্মটি প্রদর্শিত করেন। এই আধুনিক লোকায়ত ক্রুশবিদ্ধকরণ তার সমসাময়িকদের চমকে দেয় এবং The waste Land-এর মতো এটাও ছিল ভাবীসূচক একটা বক্তব্য এবং নতুন বিশ্বের কাছে এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে নব জাগরণের প্রয়াস।

চিত্রকর্মটা ছিল করুণাঋদ্ধ, অন্যের যন্ত্রণা অনুভব করার ক্ষমতাযুক্ত। প্রাচীন পৌরাণিক নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক সময় উৎসর্গ একটা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। প্যালিওলিথিক সময়ে মানুষ যেসব পশু শিকার এবং হত্যা করতো তারা তাদের প্রতি এক ধরনের যন্ত্রণাদায়ক স্বভাবগত সাযুজ্য অনুভব করতো। উৎসবের আচার অনুষ্ঠানে তারা তাদের এই অপরিণত দুর্দশা ব্যক্ত করতো যা মানবতার খাতিরে হত হওয়া সেই জন্তুকে সম্মান জানাত। গুয়েরনিকায়, মানুষ আর পশু উভয়েই এলোপাথাড়ি বাছবিচারহীন হত্যাযজ্ঞের শিকার, তালগোল পাকিয়ে একটা স্তূপের ন্যায় পড়ে আছে, যন্ত্রণায় অস্থির ঘোড়া অনিস্তার্যভাবে কবন্ধ শবের সাথে জড়িয়ে যায়। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার অগণিত চিত্রে ক্রুশের পায়ের কাছের রমণীদের কথা মনে করিয়ে দেয়, দুই মহিলার চোখে আহত ঘোড়ার যন্ত্রণার সাথে বিষাদঘন একাত্মতা। প্রাগৈতিহাসিক সমাজে মহান মাতা একজন অপ্রশম্য শিকারী, কিন্তু পিকাসোর চিত্রকর্মে, মা তার মৃত সন্তানের নিস্তেজ শরীর জড়িয়ে আছে, নিজেই উপদ্রুত হয়ে নির্বাক আর্তনাদে মুখরিত। তার পেছনেই একটা মোষ, যা পিকাসো বলেন, নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। বুলফাইটের দর্শনীয় আচারঅনুষ্ঠান সবসময়েই পিকাসোকে মুগ্ধ করেছে, স্পেনের এই জাতীয় খেলার যোগ আছে অতীতের উৎসর্গের আনুষ্ঠানিকতার সাথে। পিকাসোর মোষ দেখতে নির্মম না; অন্যান্য উপদ্রুতদের সাথে সে দাঁড়িয়ে, লেজ আছড়ায় আর দৃশ্যপট জরিপ করে। হয়তো এটাই বোঝাতে চায় সে বুলফাইটের সেই মুহূর্তে সে পৌঁছে গেছে যখন সে আক্রমণ বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ চিন্তা করছে। কিন্তু নিজেই বলির শিকার হবার কারণে, নিষ্ঠুরতার প্রতীক, মোষের ধ্বংস অনিবার্য। আর তাই– পিকাসোও হয়তো বলতে চান– আধুনিক মানবতাও তাই যা– যদিও পিকাসোর পক্ষে সেটা জানা সম্ভব না– যৌক্তিকভাবে নিরূপিত হিংসা আর আত্মনাশী প্রবণতার পূর্ণ সম্ভাবনা সবেমাত্রই খোঁজ করতে শুরু করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস লিখিয়ের দলও আধুনিকতার দুর্দশা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন। The Waste Land-এর সাথে একই বছর প্রকাশিত জেমস জয়েসের *ইউলিসিসের* কথা আমাদের ভাবা উচিত, যেখানে রয়েছে হোমারের *ওডেসির* বিভিন্ন অধ্যায়ের সাথে জয়েসের সমসাময়িক মুখ্য চরিত্রদের অভিজ্ঞতার একটা সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনা। মায়াবী বাস্তববাদীর দল– হোর্হে লুইস বোর্হেস, গুন্টার গ্রাস, ইটালো ক্যালভিনো, অ্যানজেলা কার্টার, সালমান রুশদী– লোগোসের আধিপত্যের প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন অব্যক্তের সাথে বাস্তবতাকে জুড়ে দিয়ে এবং রূপকথা আর স্বপ্নের পৌরাণিক যুক্তির দ্বারা আটপৌরে যুক্তির বিন্যাসকে একত্রিত করে। অন্য লেখকরা ভবিষ্যতের দিকে চোখ মেলেছেন। জর্জ অরওয়েলের *Nineteen Eighty Four* (১৯৪৯) পুলিশী রাষ্ট্রের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দেয় যেখানে জোর যার মুল্লুক তার আর বর্তমানের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য অতীতকে ক্রমাগত বদলানো হয়। অরওয়েলের বক্তব্যের যথাযথ ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রচুর তর্ক হয়েছে কিন্তু অতীতের মহান পুরাণের ন্যায়, এটা লৌকিক চেতনার প্রকাশ করেছে। উপন্যাসটার অনেক বাক্য আর দৃশ্যকল্প আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রবেশ করেছে : বিগ ব্রাদার, ডবলথিঙ্ক, নিউজস্পেক, এবং রুম ১০১ এখনও ব্যবহৃত হয় ধারা চিহ্নিত করতে এবং আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যাবলী বোঝাতে, উপন্যাসটা যারা পড়েনি এমনকি তারাও এগুলো ব্যবহার করে।

কিন্তু লোকায়ত একটা উপন্যাস কি সত্যিই সনাতন পুরাণের পুনরাবৃত্তি করতে পারে, যেখানে দেবতা আর দেবীরা থাকবে? প্রাক আধুনিক পৃথিবীতে আমরা দেখেছি যে, পশ্চিমা *লোগোসের* দ্বারা আরোপিত অধিবিদ্যামূলক ধারণার শব্দ দ্বারা খুব কমই ঐশ্বরিকতাকে বোঝানো হতো কিন্তু মানুষকে তাদের মানবতা বোঝাতে যা সাধারণত সাহায্য করে। মানুষের অবস্থা বদলাবার সাথে সাথে, দেবতারা অনেক সময় অপসৃত হয়ে পুরাণে এবং ধর্মে একটা প্রান্তিক স্থান নেয়; কখনও অবশ্য একেবারেই হারিয়ে যায়। সমসাময়িক উপন্যাসের দেবতাহীন পুরাণে নতুন কিছু নেই যা প্রাচীন পুরাণের ন্যায় মানুষের অবস্থার একই ধরনের বিস্মৃতিপ্রবণ আর দুর্দম সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে এবং আমাদের উপলব্ধি করায় যে– কেবল দেহটা নিয়েই মানুষের অস্তিত্ব না এবং সবারই দিব্য ঐশ্বরিক মূল্য রয়েছে।

পুরাণ নির্মাতাদের মতো লেখক আর শিল্পী দলের মাঝে একই মাত্রার বোধ কাজ করায়, সহজাতভাবেই তারা একই ধরনের ভাবধারার সহায়তা নেয়। জোসেফ কনরাডের Heart of Darkness কে একটা বীরোচিত অভিযাত্রা আর দীক্ষা হিসাবে দেখা যেতে পারে যা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯০২ সালে প্রকাশিত, পশ্চিমের মোহভঙ্গ শুরু হবার ঠিক আগে, উপন্যাসটা আফ্রিকার গহীন বনে অতি-সভ্য মি. কার্টজের কিছুকাল অবস্থানের বর্ণনা। সনাতন পুরাণে, সামাজিক পৃথিবীর নিরাপত্তা পেছনে রেখে নায়ক এগিয়ে যায়। কখনও তাকে পাতালে নামতে হলে, সেখানে তার সাথে হয়তো নিজের অশঙ্কিত সত্তার দেখা হয়। বিচ্ছিন্নতা আর বঞ্চনার অভিজ্ঞতা থেকে স্নায়বিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে, যা জীবনীয় অন্তর্জ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফল হলে, নায়ক নতুন আর মূল্যবান কিছু একটা নিয়ে নিজের লোকের কাছে ফিরে আসে। কনরাডের উপন্যাসের সর্পিল অপকারী আফ্রিকার নদী আমাদের লাসাক্সের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের কথা মনে করিয়ে দেয়, যার মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে সম্ভাব্য সদস্য পৃথিবীর জঠরে ফিরে যায়। পাতালপুরীর আদিমতম জঙ্গলে, কার্টজ সত্যিই নিজের হৃদয়ের কলুষতায় উঁকি দেয়, কিন্তু নিজের প্রত্যাবৃত্তি অব্যাহত রাখে এবং আধ্যাত্মিকতায় অবগাহন করেই মারা যায়। সে একজন শামান, মানব-এ পরিণত হয় যার হৃদয়ে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই কেবল ক্ষোভ রয়েছে যাদের উপরে সে অত্যাচার করে। পৌরাণিক নায়ক জানতে পারে যে, সে যদি নিজের সত্তাকে হত্যা করে, নতুন জীবনে তার পুনর্জন্ম হবে; কিন্তু কার্টজ বন্ধ্যা আত্মপ্রচারের ফাঁদে আটকে যায়, উপন্যাসে যখন সে শেষ পর্যন্ত এই ফাঁদ থেকে বের হয়, সে তখন সজীব শবদেহের অশ্লীলতায় পরিণত হয়েছে। নিজের খ্যাতির মোহে অন্ধ, কার্টজ বীরত্বের বদলে বন্ধ্যা খ্যাতি বেছে নেয়। জীবনের বীরোচিত প্রত্যয় ব্যক্ত করতে সে ব্যর্থ হয় : তার অন্তিম কথা 'বিভীষিকা! কি বিভীষিকা!' কার্টজের অন্তিম বাক্যকে টি.এস. এলিয়ট The waste Land-এর এপিগ্রাফ করেছেন। কনরাড, সত্যিকারের এক দৈবজ্ঞ, বিংশ শতাব্দীর স্বার্থপরতা, লোভ, নাস্তিবাদ, হতাশা আর অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে আমাদের জানিয়ে রেখেছেন।

টমাস মান তার The Magic Mountain উপন্যাসেও দীক্ষাদানের এই মোটিফ ব্যবহার করেছেন (১৯২৪), পশ্চিমা ইতিহাসের আরেক সন্ধিক্ষণে যা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি স্বীকার করেছেন যে তার আসল উদ্দেশ্য এটা ছিল না, কিন্তু হার্ভাডের এক তরুণ ছাত্র যখন তাকে বলে যে 'The Quester Hero' এর আধুনিক উদাহরণ এটা, সে সাথে সাথে অনুধাবন করে যে আসলেও তাই ঘটেছে। বীরোচিত অভিযানের পুরাণ তার অবচেতনে প্রোথিত ছিল এবং না বুঝেই তিনি এর উপরে নির্মাণ শুরু করেন যা তিনি করেছেন। মানের উপন্যাসের ডাভোস আরোগ্য নিকেতন পরিণত হয় 'দীক্ষাদানের আচার অনুষ্ঠানের মন্দিরে, জীবনের রহস্যময়তা সম্বন্ধে রোমাঞ্চাভিলাষী অনুসন্ধানের স্থান'। হানস কাস্ট্রপ, তার নায়ক, হলি গ্রেইলের সন্ধানী, 'জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর পবিত্রতার' স্মারক জীবনকে যা অর্থবহ করে তোলে। কাস্ট্রপ 'স্বেচ্ছায় রোগ আর মৃত্যুকে বরণ করেন কারণ তাদের সাথে তার প্রথম যোগাযোগেই তারা তাকে অসাধারণ অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অবশ্য এর সাথে বিশাল ঝুঁকিও রয়েছে'। আর তারপরেও, এই আধুনিক দীক্ষাদান একই সাথে বিংশ শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান তুচ্ছতাকে ধারণ করে। আরোগ্য নিকেতনের রোগীদের মাঝে মানব 'বিচ্ছিন্নতা আর ব্যক্তিবাদের একটা মনোহর চক্র' তৈরি হতে দেখেন। সনাতনের সন্ধানীরা যেখানে নিজের সমাজের মঙ্গল সাধন করতে চায় সেখানে কাস্ট্রপ মগ্ন থাকে এক আত্মকেন্দ্রিক, পরজীবী আর চূড়ান্তভাবে লক্ষ্যহীন সাধনায়।[১০৭] তার মায়াবী পাহাড়ে সে সাত বছর কাটায়, মানবতার জন্য নিজের মহান স্বপ্নগুলোর কথা ভাবে, কেবল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যাবার জন্য, যাকে ইউরোপের সম্মিলিত আত্মহনন বলে অভিহিত করা চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যালকম লোউরির Under the Volcan (১৯৪৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে মেক্সিকোর প্রেক্ষাপটে রচিত। কনসাল, এক পাড় মদ্যপের, জীবনের শেষ দিনটার সন্ধান করে, যে কিনা লোউরিরই কেবল না কিন্তু– সেটা পরিষ্কার বোঝানো হয়– আমাদের সবার আত্মস্বরূপ। বইটার শুরু ক্যান্টিনা ডেল বসকে, দান্তের ইনফার্নোর 'গহীন অরণ্যের' কথা স্মরণ করায়, ডে অব দ্য ডেডে, যখন মৃতেরা বিশ্বাস করা হয় যে, জীবিতদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। পুরো উপন্যাসে, লোউরি প্রাচীন পৌরাণিক অন্তর্জ্ঞান যা বলে জীবন আর মৃত্যু অচ্ছেদ্য তার অনুসন্ধান করেছেন। উপন্যাসে মেক্সিকোর ভূ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আর প্রাণবন্ত জীবনের– যেন একটা স্বর্গোদ্যান– বর্ণনার পাশাপাশি মৃত্যু আর অন্ধকারের নারকীয় চিত্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। আপাত তুচ্ছ বর্ণনা বিশ্বজনীন দ্যোতনা লাভ করেছে।

যুদ্ধ উপদ্রুতদের মতো যারা বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী বাঙ্কারে আত্মগোপন করে, তাদের মতো মানুষ ঝড়ের কবল থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেয়; সিনেমা হলের আলো নিভে যায় ঠিক যেমন ইউরোপে আধার নেমে এসেছিল সেভাবে। চলচ্চিত্রটার জন্য নির্মিত বিজ্ঞাপন Las Manos de Orlac, সাথে রক্ত রঞ্জিত হাড়, মানবতায় সম্মিলিত অপরাধবোধের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়; একটা নাগরদোলা সময়ের বহমানতা প্রকাশ করে; রাস্তার পাশে মৃতাপন্ন কৃষক মনে করিয়ে দেয় পৃথিবী জুড়ে মানুষ অযত্ন অবহেলায় মারা যাচ্ছে। কনসাল ক্রমশ উন্মাদ হয়ে উঠলে, তার চারপাশ একটা ভ্রমোৎপাদক তীব্রতা লাভ করে যেখানে বস্তু আর ঘটনার অস্তিত্ব একে অপরকে ছাপিয়ে যায়। প্রাচীন পুরাণে সবকিছুরই ঐশ্বরিক গুরুত্ব ছিল এবং কোনো একটা বস্তু বা কর্মকাণ্ড লৌকিক ছিল না। লোউরির উপন্যাসের ডে অব দ্য ডেডের সময় গড়িয়ে চললে, কিছুই নিরপেক্ষ থাকে না : সবকিছুতেই নিয়তি নির্ধারিত গুরুত্ব আরোপিত হয়।

১৯৩৯ সালের পূর্বের পৃথিবীর মাতাল অবস্থা উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কনসালের গ্রহণ করা প্রতি পাত্র মদ তাকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেয়। কনসালের ন্যায়, মানবতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে এবং বিপদের দিকে ধেয়ে চলেছে। শেষ ইচ্ছার কাছে নত হয়ে জীবন আর অভিব্যক্তির ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলছে। কাবালাহ্‌কে মরমী সাধকের সাথে তুলনা করা হয় যে মদ্যপের সাথে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। উপন্যাসের এটাই কেন্দ্রীয় ধারণা : ক্ষমতা হারানো জাদুকরের ন্যায় মানুষও এমন শক্তির অধিকারী হয়েছে যা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করে তবে থামবে। লোউরি আমাদের বোঝাতে চান তিনি এখানে পারমাণবিক বোমার কথা ভাবছেন। কিন্তু তারপরেও উপন্যাসটা নাস্তিবাদী না, মানবতার প্রেমময় উদ্ভটত্ব এবং সৌন্দর্য্য আর করুণরসের স্মৃতিচারণের মাঝে একটা গভীর সহমর্মিতার রেশ পাওয়া যায়।

আমরা দেখেছি যে পুরোপুরি লৌকিক প্রেক্ষাপটে কোনো পুরাণকে অনুধাবন করা সম্ভব না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে ভিন্ন বিধিবদ্ধ ছকেই কেবল একে বোঝা সম্ভব; নিজস্ব রূপান্তরের প্রক্রিয়ার একটা অংশ হিসাবে একে অনুভব করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এর কিছুই উপন্যাসের প্রতি আরোপ করা যায় না, কোনো প্রকার আচার অনুষ্ঠানের বিধিবিধান ছাড়াই যে কোনো স্থানে এটা পাঠ করা যায় এবং অবশ্যই, যদি এতে কোনো লাভ হয়, প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকে। তবু উপন্যাস পাঠের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের পুরাণের সনাতন চেতনার কথা মনে করিয়ে দেয়। ধ্যানের একটা রূপ হিসাবে একে দেখা যেতে পারে। কয়েকদিন বা সপ্তাহ পাঠক একটা উপন্যাসের সাথে বাস করে। এটা তাদের সমান্তরাল কিন্তু সাধারণ আটপৌরে জীবন থেকে আলাদা একটা জগতে নিয়ে যায়। তারা ভালোমতোই জানে এই কল্পিত জগৎ 'সত্যি' না কিন্তু পাঠ করার সময় সত্যি ভাবতে বাধ্য হয় তারা। শক্তিশালী কোনো উপন্যাস পাঠ শেষ করার অনেক পরেও সেটা আমাদের জীবনের প্রেক্ষাপটের একটা অংশে পরিণত হয়। এটা ভান করার একটা খেলা যা, যোগ ব্যায়াম বা ধর্মীয় উৎসবের ন্যায়, সময় এবং স্থানের বন্ধনী ভেঙে আমাদের সহানুভূতি উজ্জীবিত করে যার ফলে অন্যের জীবন তাদের দুঃখ আমরা অনুভব করতে পারি। এটা করুণা করতে শেখায়, অন্যের 'সাথে অনুভব' করার ক্ষমতা আমাদের শেখায়। এবং পুরাণের মতো, একটা ভালো উপন্যাসও রূপান্তর করার ক্ষমতা রাখে। আমরা যদি সুযোগ দেই তাহলে চিরতরে সে আমাদের বদলে দিতে পারে।

পৌরাণিক তত্ত্ব, আমরা দেখেছি, শিল্পকলার একটা মাধ্যম। যে কোনো শক্তিশালী শিল্পকর্ম আমাদের সত্তাকে জারিত করে এবং চিরতরে বদলে দেয়। বৃটিশ সমালোচক জর্জ স্টেইনার দাবী করেন যে চিত্রকলা, নির্দিষ্ট ধর্মীয় আর অধিবিদ্যামূলক অভিজ্ঞতার ন্যায়, সবচেয়ে '"প্রবেশক্ষম," রূপান্তরক্ষম মানুষের অভিজ্ঞতা যার শরণ নিতে পারে'। এটা উদ্বেধী, অধিক্রামক, অবিচারণা যা 'আমাদের অস্তিত্বের শেষ নিভৃত স্থানের অনুসন্ধানে রত; একটা ঘোষণা যা আমাদের সতর্ক সত্তাকে ভেঙে ছোট ছোট ঘরে পরিণত করে,' যাতে করে 'পূর্বের ন্যায় একইভাবে এটা আর বাসযোগ্য না থাকে'। এটা একটা সর্বব্যাপী যোগাযোগ যা আমাদের বলে, আক্ষরিক অর্থে : 'তোমার জীবনকে বদলে নাও'।[১০৮]

যদি গভীর মনোযোগ সহকারে এটা লেখা আর পড়া হয়, একটা উপন্যাস, পুরাণের ন্যায় বা শিল্পকলার অন্য যে কোনো মহান স্মারকের ন্যায়, প্রত্যুপক্রমে পরিণত হয় যা আমাদের সাহায্য করে জীবনের এক পর্যায় থেকে, মনের এক অবস্থা থেকে, যন্ত্রণাময় কৃত্যের দ্বারা অন্য স্তরে যেতে। উপন্যাস পুরাণের ন্যায়, পৃথিবীকে ভিন্ন চোখে দেখতে আমাদের শেখায়; এটা আমাদের শেখায় কিভাবে নিজের হৃদয়ে উঁকি দিতে হয় এবং এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবীকে দেখতে শেখায় যা আমাদের ব্যক্তিস্বার্থকে ছাপিয়ে যায়। যদি পেশাদার ধর্মীয় নেতারা পৌরাণিক বিদ্যায় আমাদের অবহিত করতে না পারে, তাহলে আমাদের লেখক আর চিত্রকরের দল হয়তো এই যাজকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত পথ হারানো পৃথিবীতে নতুন অন্তর্জ্ঞান নিয়ে আসতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

1 Mircea Eliade, *The Myth of the Eternal Return or Cosmos and History* (trans. Willard R. Trask, Princeton, 1994), passim.
2 J. Huizinger, *Homo Ludens* (trans. R.F.C. Hall, London), 1949, 5-25.
3 Huston Smith, *The Illustrated World Religions, A Guide to our Wisdom Traditions* (San Francisco, 1991), 235.
4 Mircea Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries, The Encounter between Contemporary Faiths and Archaic Realities* (trans. philip Mairet, London, 1960), 59-60.
5 Ibid., 74.
6 Mircea Eliade, *Patterns in Comparative Religion* (trans. Rosemery Sheed, London, 1958), 216-19; 267-72.
7 Ibid., 156-8.
8 Eliade, *Patterns in Comparative Religion*, 38-58.
9 Rudolf Otto, *The Idea of the Holy, An Inquiry into the non-rational factor in the idea of the divine and its relation to the rational* (trans. John Harvey, Oxford, 1923), 5-41.
10 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 172-8; Wilhelm Schmidt, *The Origin of the Idea of God* (New York, 1912), *passim*.
11 Eliade, *Patterns in Comparative Religion*, 99-108.
12 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 54-86.
13 Joseph Campbell with Bill Moyers, *The power of Myth* (New York, 1988), 87.
14 Ibid.
15 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 63.
16 Walter Burkert, *Homo Necans, The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth* (trans. peter Bing, Los Angeles, Berkeley and London, 1983), 88-93.
17 Ibid., 15-22.
18 Campbell, *The Power of Myth*, 72-74; Burkert, *Homo Necans*, 16-22.
19 Joannes Sloek, *Devotional Language* (trans. Henrik Mossin, Berlin and New York, 1996), 50-52, 68-78, 135.
20 Walter Burkert, *Structure and History in Greek Mythology and Ritual* (Berkeley, Los Angeles and London, 1980), 90-94; Joseph Campbell, *Historical Atlas of World Mythology; Volume 2: The Way of the Animal Powers; Part 1: Mythologies of the Primitive Hunters and Gatherers* (New York, 1988), 58-80; *The Power of Myth*, 79-81.
21 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 194-226; Campbell, *The Power of Myth*, 81-85.
22 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 225.
23 Campbell, *The Power of Myth*, 124-25.
24 Burkert, *Homo Necans*, 94-5.
25 Homer, *The Iliad*, 21:470.
26 Burkert, *Greek Religion*, 149-152.
27 Burkert, *Homo Necans*, 78-82.
28 Eliade, *Patterns of Comparative Religion*, 331-343.
29 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 138-40; *Patterns in Comparative Religion*, 256-261.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

30 Hosea 4:11-19; Ezekiel 8:2-18;2 Kings 23:4-7.
31 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 161-171; *Patterns in Comparative Religion*, 242-253.
32 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 162-65.
33 Ibid., 168-171.
34 Ibid., 188-89.
35 Genesis 3:16-19.
36 Anat_Baal Texts 49:11:5; quoted in E.O. James, *The Ancient Gods* (London, 1960), 88.
37 'Inanna's Journey to Hell' in *Poems of Heaven and Hell from Ancient Mesopotamia* (trans. and ed. N.K. Sanders, London, 1971), 165.
38 Ibid., 163.
39 Campbell, *The Power of Myth*, 107-11.
40 Ezekiel 8:14; Jeremiah 32:29, 44:15; Isaiah 17:10.
41 Burkert, *Structure and History*, 109-110.
42 Burkert, *Structure and History*, 123-28; *Homo Necans*, 255-297; *Greek Religion*, 159-161.
43 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries*, 227-8; *Patterns in Comparative Religion*, 331.
44 Karl Jaspers, *The Origin and Goal of History* (trans. Michael Bullock, London, 1953), 47.
45 Gwendolyn Leick, *Mesopotamia, The Invention of the City* (London, 2001), 268.
46 Genesis 4:17.
47 Genesis 4:21-22.
48 Genesis 11:9.
49 Leick, *Mesopotamia*, 22-23.
50 In other epics, Atnahasis is called Ziusudra and Utrapishtim ('he who found life').
51 Thokhild Jacobsen, 'The Cosmos as State' in H. and H.A. Frankfort (eds), *The Intellectual Adventure of ancient Man. An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East* (Chicago, 1946), 186-197.
52 Ibid., 169.
53 *Enuma Elish*, I:8-11, in Sandars, *Poems of Heaven and Hell, 73.*
54 *Enuma Elish, VI:19, in Sanders, Poems of Heaven and Hell, 99.*
55 Isaiah 27:1 Job 3:12; 26:13; Psalms 74:14.
56 Eliade, *Myths, Dreams and Mysteries, 80-81; The Myth of the Eternal Return*, 17.
57 *The Epic of Gilgamesh*, I:iv:6, 13,19, *Myths from Mesopotamia, Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others* (trans. Stephanie Dalley, Oxford, 1989), 55.
58 Ibid., I:iv: 30-36, p. 56.
59 Ibid., VI:ii:1-6, p. 78.
60 Ibid., VI:ii: 11-12, p. 78-9.
61 Ibid., XI:vi:4, p. 118.
62 David Damrosch, *The Narrative Covenant. Transformations of Genre in the Growth of Biblical Literature* (san Francisco, 1987), 88-118.
63 *Epic of Gilgamesh*, XI:ii:6-7 in Dalley, 113.
64 Ibid., I:9-12, 25-29, p.50.
Ibid., 1:4-7, p.50.
66 Robert A. Segal, 'Adonis: A Greek Eternal Child' in Dora C. pozzi and John M. Wickersham (eds), *Myth and the polis* (Ithaca, New York and London, 1991), 64-86.
67 Karl Jaspers, *The Origin and Goal of History* (trans. Michael Bullock, London 1953), 1-78.
68 The author of the *Dao De Jing*, which did not become known until the mid-third century, was using the name of the fictitious sage Laozi, who was often thought to have lived in the late seventh or sixth century, as a pseudonym.
69 Genesis 18.
70 Isaiah 6:5; Jeremiah 1:6-10; Ezekiel 2:15.
71 Confucius, *Analects* 5:6; 16:2.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

72 Sadly, inclusive language is not appropriate here. Like most of the Axial sages, Confucius had little time for woman.
73 Confucius, Analects, 12:22; 17:6.
74 Ibid., 12:2.
75 Ibid., 4:15.
76 Ibid., 8:8.
77 Ibid., 3:26;17:12.
78 *Anguttara Nikaya*, 6:63.
79 *Dao De Jing*, 80.
80 Ibid., 25.
81 Ibid., 6,16, 40, 67.
82 *Fataka*, 1:54-63; *Vinaya : Mahavagga*, 1:4.
83 Psalm 82.
84 2 Chronicles, 34:5-.
85 Hosea, 13:2; Jeremiah, 10; Psalms 31:6; 115:4- 8; 135:15.
86 Exodus, 14.
87 Isaiah, 43:11-12.
88 Plato, *The Republic*, 10:603D-607A.
89 Ibid., 522a8; Plato, *Timaeus*,26E5.
90 *Metaphysics* III, 1000al 1-20.
91 Plato, *The Republic*, 509F.
92 Plato, *Timaeus*, 29B and C.
93 Aristotle, *Metaphysics*, 1074 Bf.
95 Philippians, 2:9
94 2 Corinthians, 5:16.
96 Philippians, 2:9-11.
97 Philippians, 2:7-9.
98 Luke, 24:13-22.
99 Kabbalists stressed that En Sof was neither male nor female. It was an 'If' that became a 'Thou' to the mystic at the end of the process of emanation.
100 Gregory of Nyssa, 'Not Three Gods'.
101 Richard S. Westfall, 'The Rise of Science and the Decline of Orthodox Christianity: A Study of Kepler, Descartes and Newton' in David C. Lindberg and Ronald L. Numbers (eds), *God and Nature : Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science* (Berkeley, Los Angeles and London, 1986), 231.
102 Gregory of Nazianzos, *Oration*, 26:6-10.
103 Blaise Pascal, *Pensees* (trans. A.J. Krasilsheimer, London, 1966), 209.
104 R.C. Lovelace, 'Puritan Spirituality : The Search for a Rightly Reformed Church' in Louis Dupre and Don E. Saliers (eds), *Christian Spirituality : Post Reformation and Modern* (London and New York, 1989), 313-15.
105 T.H. Huxley, *Science and Christian Tradition* (New York, 1896), 125.
106 Friedrich Nietzsche, *The Gay Science* (New York, 1974), 181.
107 Thomas Mann, 'The Making of *The Magic Mountain*,' in *The Magic Mountain*. (trans. H.I. Lowe Porter, London, 1999), 719-29.
108 George Steiner, *Real Presences; Is there anything in what we say*? (London, 1989), 142-43.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~